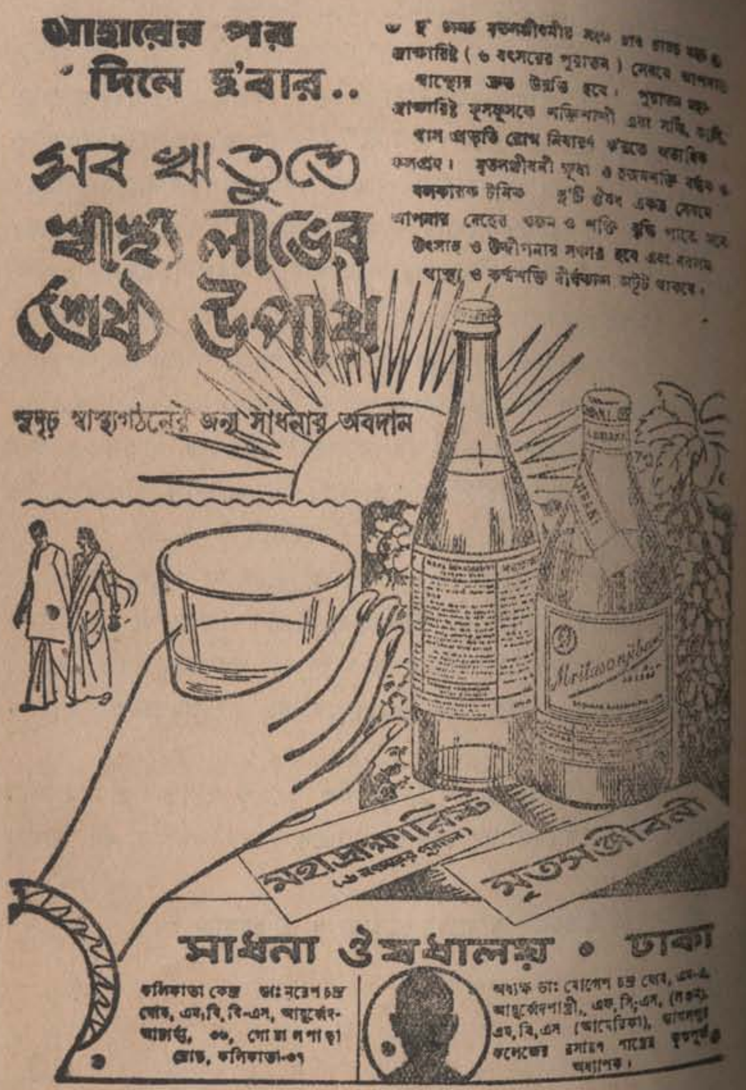

আহারের পর
দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
দুই ড্রাম মৃতসঞ্জীবনীর সঙ্গে মহাদ্রাক্ষারিষ্ট (৬ বৎসরের পুরাতন) সেবনে আপনার স্বাস্থ্যের দ্রুত উন্নতি হবে। পুরাতন মহাদ্রাক্ষারিষ্ট ফুসফুসকে শক্তিশালী এবং সর্দি, কাশি, শ্বাস প্রভৃতি রোগ নিবারণ করতে অব্যর্থ ফলপ্রদ। মৃতসঞ্জীবনী ক্ষুধা ও হজমশক্তি বর্ধক ও বলকারক টনিক। দু'টি ঔষধ একত্র সেবনে আপনার দেহের ওজন ও শক্তি বৃদ্ধি পাবে, সঙ্গে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হবে এবং বরাবর স্বাস্থ্য ও কর্মশক্তি দীর্ঘকাল অটুট থাকবে।
সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
Mritasanjibani
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা
কলিকাতা কেন্দ্র ডাঃ নরেশ চন্দ্র ঘোষ, এম,বি,বি-এস, আয়ুর্বেদাচার্য্য, ৩৬, গোয়ালপাড়া রোড, কলিকাতা-৩৭
অধ্যক্ষ ডাঃ যোগেশ চন্দ্র ঘোষ, এম-এ, আয়ুর্বেদশাস্ত্রী, এফ,সি,এস, (লণ্ডন), এম,বি,এস (আমেরিকা), ভাগলপুর কলেজের রসায়ন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক।


পরিচয়
সংখ্যা
১৩৭০

পরিচয়

বর্ষ ৩৩ । সংখ্যা ৪
কার্তিক, ১৩৭০

সূচীপত্র

স্কেচ—নিখিল বিশ্বাস, বিজন চৌধুরী

প্রচ্ছদ—কানু বসু

সম্পাদক
গোপাল হালদার ॥ মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

পরিচয় (প্রা) লিঃ-এর পক্ষে অচিন্ত্য সেনগুপ্ত কর্তৃক নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ৬ চালতাবাগান লেন, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত ও ৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭ থেকে প্রকাশিত।



[নিখিল বিশ্বাস

রণজিৎ দাশগুপ্ত

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশের রূপরেখা

১৯৬৩ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর তিনটি ঘটনার জন্য বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ও বিশেষত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে লোকসভায় প্রথম অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে কৃপালনী-মাসানী-লোহিয়ার নায়কত্বে সমস্ত অ-কমিউনিস্ট বিরোধী দলের গাঁটছড়া বন্ধন এই তিনটি ঘটনার একটি। দ্বিতীয়টি হল কামরাজ পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনা অনুসারে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলির পুনর্গঠন। তৃতীয় ঘটনাটি হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে গণ-আবেদনপত্রে এক কোটি স্বাক্ষর ও দুই লক্ষ মানুষের ঐতিহাসিক দিল্লী অভিযান।

এই তিনটি ঘটনাই একটি বিশেষ দিকে সুনিশ্চিতভাবে ইঙ্গিত করে—সেটি হল যে ভারতের সামাজিক-অর্থনৈতিক বিকাশধারা আজ এক সন্ধিমুহূর্তে এসে দাঁড়িয়েছে। আর এই সন্ধিমুহূর্তে এদেশের স্বাধীনতা-উত্তর সমাজ-বিকাশের বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য অনুধাবন ও সম্যক মূল্যায়নের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমান রচনায় এই প্রয়াসটিই করা হবে। তবে একটি রচনার পরিসরে এমন জটিল ও বিতর্কমূলক বিষয়ের আলোচনা কোনো কোনো দিক থেকে অসম্পূর্ণ ও সীমাবদ্ধ বা কোনো কোনো সিদ্ধান্ত নিতান্ত আপাতত ধরনের (tentative) হতে বাধ্য, একথা গোড়াতেই বলে রাখা উচিত।

এক

আজ একথা আর বিশদ ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না যে, ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট ভারতের ইতিহাসে এক পর্বান্তর। সেদিনের ক্ষমতা হস্তান্তর এক রাজশক্তির পরিবর্তে নেহাৎই আর এক রাজশক্তির আবির্ভাব নয়। ঐ পরিবর্তন সূচিত করেছে রাজনৈতিক বিপ্লব—সাম্রাজ্যবাদী শাসক শ্রেণীর হাত থেকে ভারতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জন, ভারতীয় সামাজিক শক্তি ও আলোড়নের প্রবল আত্মপ্রতিষ্ঠা।

এই সাফল্য অবশ্য সহজে অর্জিত হয় নি। এর পিছনে ছিল এদেশের লক্ষ-কোটি মানুষের নানা মোহ, কাব্য, বীরত্ব, সৌন্দর্য, আত্মত্যাগ, আশা-আকাঙ্ক্ষায় ভরা সুদীর্ঘ বিপ্লবাত্মক তৎপরতা। এই বিশাল আলোড়নের নেতৃত্ব ছিল অবশ্য জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর। ফলে ১৯৪৭-এ যে স্বাধীন সরকারের প্রতিষ্ঠা ঘটল তাতে স্থান পেল এই বুর্জোয়া শ্রেণী। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই রাজনৈতিক পরিবর্তনের বৈপ্লবিক প্রকৃতির দরুন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের পক্ষে এটি হয়েছে সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যসম্পন্ন।

ঔপনিবেশিকতার শৃঙ্খল মোচনের পর সমস্যা ছিল জটিল ও বহুবিধ। প্রথমত, যে পরিবর্তন ঘটল তা শুধুমাত্র রাজনৈতিক, এবং সাম্রাজ্যবাদের ভেদ-বিভেদ নীতি ও জাতীয় নেতৃত্বের দুর্বলতার দৌলতে এই স্বাধীনতা অর্জিত হল দেশ-বিভাগ ও ভ্রাতৃহত্যার শোকাবহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে। সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে নানা বন্ধন, ঔপনিবেশিক ও আধা-সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতির চক্রব্যূহ এবং জনসাধারণের শোচনীয় জীবনমানের দরুন খণ্ডিত ভারতের এই স্বাধীনতারও বনিয়াদ ছিল অত্যন্ত সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ফেলে-যাওয়া আবর্জনাস্তূপই শুধু নয়, এর উপরে ছিল এমন কি প্রাক্-ব্রিটিশ ও প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সামাজিক রাজনৈতিক শ্রেণী ও সম্পর্কের নানা অবশেষ—শত শত দেশীয় রাজ্য ও সেগুলির রাজা-রাজড়াদের সামাজিক প্রভাব, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক সঙ্কীর্ণতা কিংবা বর্ণ হিন্দুর উগ্র জাত্যাভিমান, নিম্নবর্ণের অনুন্নত অবস্থা, বহুসংখ্যক আদিম উপজাতির পশ্চাদ্পদতা অথবা অস্পৃশ্যতা, বর্ণবৈষম্য, নারীসমাজের মর্যাদাহীনতার অভিশাপ। এ সবই জাতীয় সংহতি ও প্রগতি এবং সেই হিসেবে ভারতের স্বাধীনতারও পরিপন্থী।

এই পরিস্থিতিতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন নতুন দিগন্তকে উন্মোচিত করলেও তা ভারতীয় জনসাধারণের সুদীর্ঘ বিপ্লব-সাধনার শেষ কথা ছিল না। দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের রক্ষা ও প্রসার, এবং তারই উপায় হিসেবে একদিকে বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীন পররাষ্ট্র নীতি রচনা, আর অন্যদিকে আভ্যন্তরীণ জীবনে জাতীয় সংহতি, রাজনৈতিক গণতন্ত্র, সামাজিক প্রগতি এবং অর্থনৈতিক উজ্জীবনের পরস্পর-সম্পর্কিত সমগ্রতাই ঐ বিপ্লব-সাধনার, বা মার্কসীয় পরিভাষায়, বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির মর্মবস্তু। আর এ সবই ভারতীয় বিপ্লবাত্মক প্রয়াসের মূল অভীষ্ট হয়ে পড়েছিল। স্বভাবতই গত ষোল বছরে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ইতিহাস বিচার করতে হবে ঐ অভীষ্ট সিদ্ধির পথে অগ্রগতির মাপকাঠিতে।

দুই

ভারতের স্বাধীনতা-প্রাপ্তি ও তার পরবর্তী বিকাশ প্রসঙ্গে প্রথমেই যে সব বিষয় নজরে আসে তার মধ্যে অন্যতম হল দেশ-বিভাগ ও ফলস্বরূপ ভারতবর্ষের অঞ্চলগত সঙ্কোচন। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা অপরিসীম তাৎপর্যসম্পন্ন ঘটনা যে, আসমুদ্র হিমাচল ভারত এবারেই সর্বপ্রথম ঐক্যবদ্ধ হল একটি রাষ্ট্রে, একই কর্তৃপক্ষের প্রতি অখণ্ড আনুগত্যের ভিত্তিতে। অতীতের যে কোনও সাম্রাজ্যের তুলনায়—তা সে মৌর্য, গুপ্ত বা মোগল যাই হোক না কেন—শুধু যে ঐক্যই ব্যাপকতর তা নয়, অঞ্চলগত ব্যাপ্তিও অনেক বেশি। বাস্তবিকপক্ষে ব্রিটিশ আমলেও তো অখণ্ড ভারতবর্ষের দুই-পঞ্চমাংশ অঞ্চল জুড়ে দেশীয় রাজ্যগুলির উপরে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো সার্বভৌম কর্তৃত্ব ছিল না।

ভারতীয় রাষ্ট্রের এই ঐক্য ও আঞ্চলিক সংহতি সাধন যে কত বড় কৃতিত্ব সেটা উপলব্ধি করা যায় যদি আমরা এদেশে জাতি-উপজাতি-ভাষা-ধর্ম-সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্য এবং বিশেষত অতীতের জের হিসেবে বিভেদাত্মক প্রবণতাগুলির কথা মনে রাখি। এই কৃতিত্বের ঐতিহাসিক গুরুত্ব আরও পরিষ্কার হয় যদি একথাও স্মরণে রাখা হয় যে, প্রাক্তন সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের পক্ষ থেকে স্বেচ্ছায় ক্ষমতা হস্তান্তরের মহানুভবতা ও রাজনৈতিক বিজ্ঞতার কথাও প্রচারের আড়ালে উঁকি মারছিল সদ্যলব্ধ স্বাধীনতাটিকে ধ্বংস করে

দেওয়ার উদ্দেশ্যে দেশ-বিভাগ, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে স্থায়ী বিরোধ, কাশ্মীর আক্রমণ, সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ, ভারতের "দুই-তৃতীয়াংশ অঞ্চল জুড়ে আট কোটি অধিবাসী অধ্যুষিত ছশোরও বেশি ছোট-বড় সামন্ত রাজ্যের অস্তিত্ব, নিজাম, হরি সিং, জুনাগড়ের নবাব বা ত্রিবাঙ্কুরের দেওয়ানদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সংহতির বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কার্যকলাপ ইত্যাদিকে পুঁজি করে ভারতকে নয়া-উপনিবেশবাদের জালে জড়িয়ে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী ও প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্ত।

কিন্তু দেশপ্রেমিক ভারতীয় জনসাধারণ, এমন কি শাসক শ্রেণী ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সে সময়ে তাঁদের সমস্ত দ্বিধা-দুর্বলতা, আপসমুখিনতা সত্ত্বেও দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদ ও তার সহযোগীদের প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। কাশ্মীরের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে ডাল হ্রদের অবিস্মরণীয় সংগ্রাম, অন্ধ্র কৃষকদের তেলেঙ্গানায় সামন্ত আধিপত্য ও রাজাকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান কিংবা ত্রিবাঙ্কুরে পুন্নাপ্রা-ভায়ালারের বীর শহীদদের আত্মত্যাগ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির আগেই জানান দিয়েছিল যে, এই সামন্ত প্রভু ও তাদের রাজত্বের অবসানের দিন আসন্ন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরেও এই গণ-আন্দোলন থামল না। আর এই পরিস্থিতিতেই সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য সদ্য-প্রতিষ্ঠিত সরকার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। এক ব্যবস্থার জোরেই শত শত বছরের ঐতিহ্যমণ্ডিত রাজতন্ত্রের অবলুপ্তি ঘটল প্রায় সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে। সংযুক্তিকরণের বিরুদ্ধে নিজামের প্রতিরোধ-প্রয়াস তাসের ঘরের মতোই ভেঙে পড়ল।

অবশ্য ভারত সরকারের এই ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না এমন নয়। রাজন্যবর্গকে বিপুল পরিমাণ ভাতা দানের ব্যবস্থা রাখা হল; কাউকে রাজপ্রমুখ, কাউকে বা কোথাও রাষ্ট্রদূত বানিয়ে দিয়ে এই প্রতিক্রিয়াশীল পরগাছা শ্রেণীটির সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির চেষ্টাও গোড়ার দিকে করা হল। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও এই সংযুক্তিকরণের মূলগত তাৎপর্য এখানে যে, এর দ্বারা [ক] নবলব্ধ স্বাধীনতার বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও [খ] রাজা-মহারাজা-নবাবদের রাজনৈতিক ক্ষমতার মেরুদণ্ড ও সামন্ততন্ত্রের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ ভেঙে দিয়ে এবং [গ] বিভেদাত্মক প্রবণতার

অন্যতম ভিত্তিকে খর্ব করে [ঘ] এদেশের ইতিহাসে অভূতপূর্ব রাজনৈতিক ঐক্য ও আঞ্চলিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করা হল। বলা বাহুল্য, এ সবই [ঙ] দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে রক্ষা ও নিরপেক্ষ করার পক্ষে পরম সহায়ক।

তিন

স্বাধীনতার প্রথম বছরগুলিতেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রের অন্যতম হাতিয়ার ছিল হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ। দেশীয় রাজা-রাজড়াদের প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় ও শহুরে মধ্যবিত্তের বিপথে-চালিত অংশবিশেষের সাহায্যে হিন্দু মহাসভা, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠান নেতৃত্ব দিচ্ছিল অরাজকতা সৃষ্টিতে, দেশের সর্বত্র সাম্প্রদায়িকতার উন্মত্ততাকে ছড়িয়ে দিতে। কিন্তু এ সবের পিছনে সাম্রাজ্যবাদের যে সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল তার স্বরূপটিকে বুঝতে সামগ্রিকভাবে বুর্জোয়া শ্রেণী ও তাদের দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতাদের বুঝতে যে দেরী হয় নি তা মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী পাঠ করলেই বোঝা যায়। সে সময়ে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অভিযানের পিছনে প্রধানত এই উপলব্ধিই কাজ করছিল যে দেশময় এই অরাজকতা জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতার পক্ষে চরম বিপজ্জনক। এই উপলব্ধির থেকেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়ার বিকট আত্মপ্রকাশের বিরুদ্ধে কংগ্রেস নেতৃত্ব উপস্থিত করলেন ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, ঐক্য ও অসাম্প্রদায়িকতার আদর্শ। এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টিও সেদিন পেছিয়ে ছিল না। আর মহাত্মা গান্ধী হয়ে দাঁড়ালেন সাম্প্রদায়িক পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে শুভবুদ্ধি, জাতীয় চেতনা ও জাতীয় সংহতির প্রতীক। সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া বনাম জাতীয় সংহতির এই সংগ্রামের পরিণতিতে অনেক জায়গাতেই দাঙ্গার আগুন নিবতে শুরু করল, শুভবুদ্ধি ছড়িয়ে পড়তে লাগল দুই রাষ্ট্রেই, গান্ধীজীর স্মরণে পাকিস্তানি নেতারাও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। আর জাতীয় চেতনার এই বলিষ্ঠ প্রকাশের সামনে মরিয়া, নৈরাশ্যে বিক্ষুব্ধ প্রতি-বিপ্লবী চক্রীদের ষড়যন্ত্রের বলি হলেন গান্ধীজী। কিন্তু গান্ধীজীর প্রাণের বিনিময়ে জাতীয় সংহতি ও স্বাধীনতা রক্ষা পেল। এর পরে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে পিছু হঠতে হল। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের মতো উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী করা হল, ভারতকে হিন্দু রাষ্ট্রে পরিণত করার অভিসন্ধি চিরকালের মতো

বিপর্যস্ত হয়ে গেল, আর সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের সুযোগে সাম্রাজ্যবাদের হস্তক্ষেপের মতলব বানচাল হয়ে গেল।

অবশ্য একথা মনে করলে ভুল হবে যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা তথা জাতীয় সংহতির সমস্যার পুরোপুরি নিরসন ঘটল। সাম্প্রদায়িকতার বিষ আজও যে পুরো ঝেড়ে ফেলা যায় নি তার প্রমাণ সম্প্রতিকালে উত্তর ভারতে জনসঙ্ঘ, আর. এস. এস. জাতীয় প্রতিষ্ঠানের অগ্রগতি, মুসলিম লীগের নতুন তৎপরতা কিংবা জব্বলপুর, আলিগড় ইত্যাদির দাঙ্গা। আর এ সবের জন্য সরকার ও শাসক পার্টির দায়িত্ব যথেষ্ট।

প্রকৃতপক্ষে জাতীয় সংহতির সমস্যাকে কী ভাবে জটিল করে তোলা হয় তার সবচেয়ে ভালো নমুনা ভাষাভিত্তিক রাজ্য পুনর্গঠন প্রসঙ্গে সরকারি মনোভাব। এককালে এই ধরনের পুনর্গঠনে কংগ্রেস প্রতিশ্রুত ছিল—অথচ স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর সর্বভারতীয় মারোয়াড়ি, গুজরাটি, তামিল, পার্শী বৃহৎ বুর্জোয়াদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে প্রতিশ্রুতি পূরণে অস্বীকৃতি জানানো হল। অন্ধ্র, কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট ইত্যাদিতে ঐ সব রাজ্যের মাঝারি বুর্জোয়া সমেত সমস্ত জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের পরই একমাত্র একভাষী রাজ্য গঠনের দাবীটি মূলত স্বীকৃত হল। আরও বহুক্ষেত্রে তো বটেই, এমন কি রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রেও জট আজও পুরো কাটে নি। কিন্তু এসব নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা পাওয়ার বছর দুয়েকের মধ্যেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াকে পরাস্ত করে জাতীয় ঐক্যকে সংহত করার তাৎপর্যকে কোনোভাবেই অতিরঞ্জিত করা সম্ভবপর নয়।

চার

সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের আশু চক্রান্তের এই সব প্রয়াসের সঙ্গে সঙ্গেই গণপরিষদ যে সংবিধান তৈরি করল তাতে, একদিকে, 'ডোমিনিয়ান স্টেটাস'-এর অবসান ঘটিয়ে ভারতকে সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে স্বাধীনতাকে আরও শক্তিশালী ও প্রসারিত করা হল, আর অন্যদিকে ব্রিটিশ আমলের পুলিসি রাজের পরিবর্তে একটি বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনা করা হল। অবশ্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রসুলভ নানা সীমাবদ্ধতা, গণতন্ত্র-বিরোধী বহু দিক থেকেই গেল। নতুন সংবিধানের আওতাতেও আমলাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, বিনা বিচার রাজনৈতিক কারণে আটকব্যবস্থা,

কিংবা শ্রমিক-কৃষকের ন্যায্য সংগ্রামের বিরুদ্ধে নির্মম দমননীতিও অব্যাহত চলে। আর বর্তমান সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর এইসব নানা সীমাবদ্ধতাকে শাসক শ্রেণী ও দলগত প্রয়োজনে জনসাধারণের স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কেমন করে ব্যবহার করা হয় তার সবচেয়ে বড় নমুনা কেরালায় কমিউনিস্ট সরকার উচ্ছেদের জন্য সংসদীয় গণতন্ত্রের ন্যূনতম রীতি-নীতিরও হত্যা। গণতন্ত্র থেকে বিচ্যুতি যে কতদূর যেতে পারে তার আর একটি নমুনা সংবিধানের মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন করে ব্রিটিশ আমলের অনুকরণে ভারত রক্ষা আইনে আটক-ব্যবস্থা।

কিন্তু আবার সাধারণভাবে 'হেবিয়াস কর্পাস' সমেত অনেকগুলি মৌলিক অধিকার সম্পর্কে নিশ্চয়তাদান, প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, ন্যায় বিচার, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা'র ধারণা-সম্বলিত 'নির্দেশমূলক নীতি' প্রণয়ন ইত্যাদি এই সংবিধানেরই সদর্থক বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো মহল অবশ্য এই সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ফ্যাসিস্ত বলে চিহ্নিত করছেন। কিন্তু একটু খোলা মনে বিচার করলেই ধরা পড়বে যে, নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ভারতে যে-পরিমাণ গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত তা এশিয়া-আফ্রিকার সদ্য-স্বাধীন দেশগুলির মধ্যে খুব কম ক্ষেত্রেই দেখতে পাওয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে সবিশেষ তাৎপর্যসম্পন্ন হল, এই সংবিধান এবং শাসন ও সামরিক ব্যবস্থায় ভারতে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-কাঠামো রচনায় সমর্থ হয়েছে যার জোরে দেখা যাচ্ছে যে, যখন এশিয়া-আফ্রিকার নতুন স্বাধীনতা-প্রাপ্ত দেশগুলির অধিকাংশতেই পার্লামেণ্টারি গণতন্ত্র ভেঙে পড়ছে, প্রাসাদ বিপ্লবের মাধ্যমে নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে কিংবা বেসামরিক কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অভ্যুত্থান মাথা-চাড়া দিচ্ছে, সে-সময়ে যে দু-চারটি দেশ এই বিপজ্জনক ধারার থেকে আজও মুক্ত তার একটি ভারত। এই ব্যাপারের গুরুত্ব আরও উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা লক্ষ্য করি যে, এই বিপজ্জনক ধারার পিছনে ওয়াশিংটন, লণ্ডন বা প্যারিসের লোভের থাবা সক্রিয় ও উদ্যত। ভারতকে অবশ্য এখনও এই থাবার আওতায় আনা যায় নি। কিন্তু ফ্রান্সের মতো দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশে দ্য গল্‌রে ব্যক্তিগত শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং আমাদের দেশে ১৯৫৯-এ থিমাইয়ার মতো ঘটনা অথবা চীনা-আক্রমণ পরবর্তী

রাজনৈতিক পটভূমিতে নিশ্চিন্ততার কোনো কারণ নেই। তবে আজও যে এদেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের কাঠামো ভেঙে পড়ে নি সেটা প্রমাণ করে, ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহীরুহের শিকড় বহুদূর বিস্তৃত ও গভীরভাবে প্রোথিত। আর এই মহীরুহ তার প্রাণশক্তি সংগ্রহ করছে জাতীয় আন্দোলনের প্রবল গণতান্ত্রিক, উদারনৈতিক ঐতিহ্য এবং সমসাময়িক ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির সবলতা ও সক্রিয়তার থেকে।

উল্লেখযোগ্য যে, এই ঐতিহ্যের মধ্যে শুধু রাজনৈতিক নয়, সামাজিক গণতন্ত্রের উপাদানও বর্তমান। জাতীয় আন্দোলনের এই গণতান্ত্রিক মানস-গঠন, বিশেষত হরিজন ও সমাজে নিপীড়িত-অপমানিতদের জন্য গান্ধীজীর গভীর সহানুভূতি ও নিরন্তর তৎপরতা, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি গত কয়েক বছরে সামাজিক প্রগতিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের পথকে প্রশস্ত করেছে। এই পথ আরও প্রশস্ত হয়েছে রাজা-মহারাজা-নবাব, জমিদার-জায়গীরদার-তালুকদারদের দেশের সামাজিক জীবনে আধিপত্য অর্থাৎ সামন্ততন্ত্রের মেরুদণ্ডটি ভেঙে যাওয়ার দরুন।

আজও আমাদের সামাজিক জীবনে নঙর্থক দিক অনেক রয়েছে, একথা সত্য। কিন্তু এটাও একটা বৃহৎ সত্য যে, ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ ব্যাপকভাবেই চারিয়ে গেছে। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ-প্রথার অবিচার দ্রুত দূর হচ্ছে; যে-সব অংশ ও বর্ণ এতদিন ছিল সামাজিক স্তরানুক্রমের একেবারে শেষ তলায় তারাও উপরে উঠে আসছে; অসবর্ণ বিবাহ সামাজিক প্রথা হিসেবে গণ্য হচ্ছে। মেয়েদের আইনগত অধিকারের ক্ষেত্রে তো রীতিমত বিপ্লব ঘটে গেছে। শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে অগ্রাহ্য করে বিবাহকে একটি চুক্তির মর্যাদাদান, বহুবিবাহ প্রথার বে-আইনিকরণ, বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকার, পারিবারিক সম্পত্তিতে মেয়েদের উত্তরাধিকারের স্বীকৃতি ইত্যাদি সবই তার নমুনা। অবশ্য অতীতের বেশ কিছু অবশেষ এখনও বর্তমান, অনেক অধিকারের মূলও শুধুমাত্র আইনগত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা একটা অনস্বীকার্য সত্য যে, সামন্ত ঐতিহ্যাশ্রয়ী সনাতন ভারত-এর শাশ্বত আদর্শ, সামাজিক চিন্তা-চেতনা ও রীতি-নীতিতে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটছে, এবং এ সবই সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে ভাবগত সংহতি তথা গণতান্ত্রিক বিপ্লব সাধনায় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

আগেই বলা হয়েছে, স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরবর্তী সমস্যার প্রকৃতি ছিল. মূলত আত্মরক্ষামূলক অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদী, প্রতি বিপ্লবী ষড়যন্ত্র ও বিভেদাত্মক অরাজকতা প্রতিরোধ। কিন্তু এই প্রাথমিক বিপদের সফল অতিক্রমণ এবং সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার পর সবথেকে জরুরী হয়ে দেখা দিল রাজনৈতিক বিপ্লবের সংহতি সাধনের জটিল প্রশ্ন। আর এ প্রশ্নের সমাধানে প্রগতিশীল বৈদেশিক নীতি এবং উপনিবেশিকতা ও সামন্ততন্ত্রের শিকড় উপড়ে ফেলে স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশের নীতি রচনা ও অনুসরণের বিষয় দুটিই ছিল চূড়ান্ত গুরুত্বসম্পন্ন।

অবশ্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয়—এ দুয়ের কোনো ক্ষেত্রেই অগ্রগতির পথ সহজ ছিল না। এ ব্যাপারে বাধা-বিপত্তি শুধু বাইরে সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি ও বৈরিতার মধ্যে ছিল তা নয়। সে-বাধার বীজ দেশের ভিতরেও ছিল। একটু গভীরভাবে অনুধাবন করলেই নজরে পড়বে যে, ভারতের আধা-ঔপনিবেশিক, আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজের রূপান্তর (বলা নিষ্প্রয়োজন, বুর্জোয়া কর্তৃত্বাধীন রাষ্ট্রে এ রূপান্তরের প্রকৃতি মূলত ধনতান্ত্রিক) ঘটছে অনেকগুলি অন্তর্বিরোধের পটভূমিতে। এ সবের মধ্যে প্রধান কয়েকটি হল:

এক। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও তার দৃশ্য-অদৃশ্য নানা গ্রন্থিবন্ধনে আবদ্ধ পরগাছা সামন্ততন্ত্র ও মুৎসুদ্দি ফড়িয়াদের জোটের বিরুদ্ধে জাতীয় বুর্জোয়া-সমেত সমগ্র জাতির সাধারণ স্বার্থ। প্রাক্-ধনতান্ত্রিক অবশেষে সমাকীর্ণ ঔপনিবেশিক দায়ভাগের সঙ্গে সামাজিক-অর্থনৈতিক অগ্রগতির এই বিরোধটিই ভারতে সমাজ বিকাশের সমসাময়িক ধারাটিকে বুঝবার চাবিকাঠি।

দুই। একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, আর অন্যদিকে জনসাধারণের বিপুল সংখ্যা-গরিষ্ঠ অংশের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় বুর্জোয়ার ভূমিকা দ্বিবিধ; রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অর্জনের পর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপে দ্বিধা ও আপস-মুখিনতা এবং গণ-আলোড়ন সম্পর্কে প্রবল ভীতি ও জন-বিরোধী নীতির অনুসরণ সুস্পষ্ট।

তিন। জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী একটিমাত্র homogenous বা সমগোত্রীয় শ্রেণী নয়। এদের মধ্যে টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদদের মতো সর্বভারতীয় একচেটিয়াপতি রয়েছে, আবার রয়েছে প্রধানত নিজ নিজ রাজ্যের গণ্ডীর

মধ্যে সক্রিয় মাঝারি ও ছোট বুর্জোয়ারা ; কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদী ধনকুবের-সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত, অনেকেই এ-জাতীয় কোনো সম্পর্কের থেকে কমবেশি মুক্ত। স্বভাবতই এদের মধ্যে আশু স্বার্থের পার্থক্য ও সংঘাত খুবই তীব্র। উপরন্তু, একচেটিয়া ধনকুবেরদের বিরোধ সমগ্র জাতির সঙ্গে, এবং এ বিরোধ বর্ধমান।

চার। ধনতান্ত্রিক রূপান্তরের জন-বিরোধী গণতন্ত্র-বিরোধী দিকের দৌলতে জাতীয় বুর্জোয়ার সঙ্গে শ্রমজীবী জনসাধারণের অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণী, মাঝারি কৃষক-সমেত কৃষকসমাজ ও শহুরে মধ্যবিত্তের বিরোধ ও সংঘর্ষ অত্যন্ত প্রবলভাবেই প্রকট।

স্বাধীন ভারতের যাত্রাপথ এই সবকটি বিরোধের অস্তিত্ব এবং এগুলির মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার নানা টানাপোড়েনের জটিল প্রক্রিয়ার সর্বাত্মক প্রভাবের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এই সব বিরোধ অর্থাৎ বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মধ্যে তীক্ষ্ণ সংগ্রামের বিস্তৃত পটেই সরকারী নীতির বিবর্তন ঘটছে, সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে রূপান্তর ঘটছে।

স্বাধীনতা পাওয়ার প্রথম তিন-চার বছরেই এই সামাজিক সংগ্রামের প্রবল প্রকাশ ঘটে একদিকে দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ, সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধ, কাশ্মীর সমস্যার মতো বিষয়কে কেন্দ্র করে সাম্রাজ্যবাদ-সামন্ততন্ত্র বা প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে, আর অন্যদিকে প্রথম সাধারণ নির্বাচনের আগে ও পরে কংগ্রেস সরকারের জন-বিরোধী ও আপসমুখীন নীতির বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত তরঙ্গে। আর এই শ্রেণী সংগ্রামেরই রাজনৈতিক প্রকাশ ঘটেছে নানা রাজনৈতিক দল ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রখর বিরোধিতায়—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও সরকারের সঙ্গে একদিকে হিন্দু মহাসভা, আর এস. এস. জনসঙ্ঘ, রামরাজ্য পরিষদ ইত্যাদির মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল দল এবং অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্যান্য বামপন্থী শক্তির মধ্যে সংঘাতে।

আর এখানেই বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য যে, বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে সংঘাত কংগ্রেসের সঙ্গে অন্যান্য অ-কংগ্রেসী দলের বিরোধেই শুধু সীমাবদ্ধ থাকে নি; এটা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান ও নেতৃত্বের ভিতরেও প্রতিফলিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এটা খুবই তাৎপর্যসম্পন্ন যে, যদিও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের নায়ক জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী ১৯৪৭-এর আগে এটাই ছিল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী সংগ্রামের ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিষ্ঠান ; আর আজও, কংগ্রেসের থেকে বামপন্থীদের

একটা বৃহৎ অংশের বিদায়গ্রহণ এবং ভাগ্যান্বেষী, দেশের স্বার্থ-বিরোধী অনেকের যোগদানের পরও, বিভিন্ন শ্রেণী ও বিপরীত শক্তি এই প্রতিষ্ঠানে সমাবেশিত ; ফলে জাতীয় চরিত্রটিও অংশত বর্তমান। তদুপরি ১৯৬০-এ স্বতন্ত্র পার্টির আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত কংগ্রেসই ছিল ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা পাওয়ার আগে তো বটেই, এমন কি পরেও নেতৃত্বের ভিতরে বারে বারেই নীতিগত ও সংগঠনগত বিরোধ দানা পাকিয়েছে।

অনেক সময়েই এই বিরোধ নেহাৎই ক্ষমতার জন্য নীতিবিবর্জিত দ্বন্দ্ব! তবে তা ভিন্ন আরও এক রকমের দ্বন্দ্ব—নীতিগত সংঘাত, বাম ও দক্ষিণ, প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার সংঘর্ষ কংগ্রেসের ভিতরে মাঝে মাঝেই আত্মপ্রকাশ করেছে। আর এই ধরনের দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে দেশের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিকাশ-ধারার উপর। স্বাধীন ভারতে গোড়ার দিকে নানা কারণ মিলিয়ে কংগ্রেসের ভিতরে বাম ও দক্ষিণের এই বিরোধ খুব প্রকট ছিল না। তবে কিছুটা প্রাথমিক স্তরের হলেও বিরোধ যে ছিল এবং সর্দার প্যাটেলই যে রক্ষণশীল ও দক্ষিণপন্থীদের নেতা ছিলেন তার বেশ কিছু সাক্ষ্য রয়েছে মৌলানা আজাদের 'আত্ম-জীবনী'-তে। আর প্রথম দিকের অস্ফুট দ্বন্দ্ব স্পষ্টতা ও তীব্রতা পেল প্যাটেলের মৃত্যুর পর দক্ষিণপন্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস সভাপতির পদে পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের নির্বাচন, ট্যাণ্ডনের সঙ্গে নেহরু ও তাঁর সমর্থকদের প্রচ্ছন্ন বিরোধ, ১৯৫১তে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে নেহরু ও আজাদের একযোগে পদত্যাগ, একই সময়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে রফি আহমেদ কিদোয়াই-এর পদত্যাগ, শেষ পর্যন্ত ট্যাণ্ডনের পদত্যাগ ও নেহরুর পক্ষ থেকে কংগ্রেস সংগঠনের প্রায় সর্বময় দায়িত্বগ্রহণ, মন্ত্রিসভায় কিদোয়াই-এর পুনরায় যোগদান ইত্যাদি সমস্ত ব্যাপারটির মধ্যে। আরও লক্ষণীয় যে, এই সব সাংগঠনিক রদ-বদল ও নেহরু নেতৃত্বের দৃঢ় প্রতিষ্ঠার পটভূমিতেই সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতি বাঁক ফিরতে শুরু করে বামের দিকে।

এ-প্রসঙ্গেই বলা উচিত যে, সে সময়েই হোক, আর তারপরেই হোক, শাসক পার্টির ভিতরে যে কোনো নীতিগত সংগ্রামে একজন দূরদর্শী বুর্জোয়া নেতা হিসেবে জওহরলালের ব্যক্তিগত ভূমিকা অসামান্য। কিন্তু

তাঁর এই ভূমিকা যে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠেছে এবং অতীতে কিংবা বর্তমানে কংগ্রেসের ভিতরে নানা দ্বন্দ্ব সুদূরপ্রসারী নীতিগত সংগ্রামের রূপ পরিগ্রহ করেছে তার পিছনে রয়েছে, প্রথমত, সত্তর-আশি বছরের গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ঐতিহ্য এবং দ্বিতীয়ত, এই প্রতিষ্ঠানে শ্রমিক-কৃষকসমেত বিভিন্ন বিরোধী সামাজিক শক্তি ও স্বার্থের সন্নিবেশ।

কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তির উপরোক্ত সংঘাতসমূহই বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি রচনা ও কার্যকরী অনুসরণের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। সেটা সম্ভবপর হয়ে উঠল মূলত বিশ্বের শক্তিবিন্যাসে মৌলিক পরিবর্তনের ফলে, বিশ্ব ইতিহাসের নিয়ন্তা হিসেবে সাম্রাজ্যবাদের পরিবর্তে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার আবির্ভাবে।

ছয়

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র নীতির বিষয়টি যদি আলাদাভাবে বিবেচনা করা হয় তবে দেখা যাবে যে, স্বাধীনতা পাওয়ার ঠিক পরের বছরগুলিতে এই নীতি পুরোপুরিভাবে সাম্রাজ্যবাদী গণ্ডীর মধ্যে আটকা না থাকলেও মোটের উপরে সেটি ছিল সাম্রাজ্যবাদ-ঘেঁষা, নানা ত্রুটি, দুর্বলতা ও অসঙ্গতিতে ভরা। স্বাধীন ভারত 'মুক্ত দুনিয়া'র যে বিশ্বস্ত মিত্র, আন্তর্জাতিক সম্মেলনাদিতে এটা প্রমাণ করাই ছিল অনেক সময়ে ভারতীয় প্রতিনিধিদের প্রয়াস। কিন্তু এটা লক্ষণীয় যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ প্রস্তুতির ষড়যন্ত্র কিংবা পারমাণবিক ব্ল্যাকমেল নীতির ফাঁসে ভারতকে সে সময়েও জড়ানো যায় নি। আর পরবর্তীকালে আফ্রো-এশীয় সংহতি আন্দোলনে ভারতের গৌরবময় ভূমিকার পূর্বাভাস মেলে ১৯৪৬ সালেই দিল্লীতে অনুষ্ঠিত এশীয় সম্মেলনে। তথাপি, সে আমলের পররাষ্ট্র নীতির মৌলিক সীমাবদ্ধতা অবশ্য স্বীকার্য।

এই সীমাবদ্ধতা ও সরকারের অনেক কাজ—যেমন, মালয়ে ঔপনিবেশিক যুদ্ধ চালানোর জন্য বৃটিশ সরকারকে এদেশের বুকের উপর বসে গোর্খা সৈন্য রিক্রুটের কিংবা ভিয়েৎনামে ফরাসী ফৌজ পাঠানোর জন্য এদেশের বিমানঘাঁটি ব্যবহারের সুযোগ দান অথবা কোরিয়ার জাতিসঙ্ঘের বেনামে মার্কিন আক্রমণের প্রতি প্রথম দিকে সমর্থন জ্ঞাপন ভারতবাসীর সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক চেতনাকে প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ করেছে। ফলে কংগ্রেস সরকার বাধ্য হয়েছেন সাধারণ মানুষের এই মনোভাবকে হিসেবের মধ্যে

নিতে। এই সঙ্গে শাসকশ্রেণী ও প্রতিষ্ঠানও উপলব্ধি করেছে যে, এশিয়া-আফ্রিকার অন্যত্র ঔপনিবেশিক আধিপত্যের অস্তিত্ব ভারতের স্বাধীনতার পক্ষেও বিপজ্জনক এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদী জোটের ঠাণ্ডা যুদ্ধের নীতি ও যুদ্ধোন্মাদ কার্যকলাপ ভারতীয় ধনিক শ্রেণীর শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের আশা-আকাঙ্ক্ষারও চরম পরিপন্থী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে যত মুনাফাদারিই ঘটে থাকুক না কেন, পারমাণবিক যুদ্ধের প্রলয়ে সব সাধই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে, এটা বুঝতে এদেশের দূরদর্শী বুর্জোয়া নেতাদের খুব বেশি দেরি হয় নি।

এই সব উপলব্ধি ও ইতিপূর্বে উল্লিখিত কারণসমূহের প্রভাবে স্বাধীনতা অর্জনের অব্যবহিত পরে ঘোষিত 'নিরপেক্ষতা' প্রথমে 'সক্রিয় নিরপেক্ষতা' ও তারপর 'জোট-নিরপেক্ষতা'র নীতিতে পরিণতি পেল। বলা যেতে পারে, কোরিয় যুদ্ধপ্রসঙ্গে নেহরু-স্তালিন বার্তা বিনিময় দিয়ে ভারতীয় পররাষ্ট্র নীতিতে পরিবর্তনের সূচনা, এবং তারপর ভিয়েৎনামে যুদ্ধ বন্ধের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ, চৌ এন লাই-এর ভারত আগমন ও পঞ্চশীল চুক্তি, ক্রুশ্চভ-বুলগানিনের ভারত সফর, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তির বিরোধিতা, 'সেন্টো-সিয়াটো'র খোঁয়াড়ে ভিড়তে অস্বীকৃতি, বান্দুং সম্মেলন, এমন কি হাঙ্গেরির প্রতি-বিপ্লবকে সমর্থন জানাতে সরাসরি অসম্মতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে পররাষ্ট্র-নীতি স্পষ্ট ও অর্থবহ হয়ে উঠল। প্রাক-স্বাধীনতা পর্বে কংগ্রেসী বৈদেশিক নীতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য তাকে বহন করে যে নতুন পররাষ্ট্র নীতি বিবর্তিত হল তার মর্মবস্তু: যুদ্ধ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা, এশিয়া-আফ্রিকার দেশে দেশে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রামের প্রতি সক্রিয় সংহতি জ্ঞাপন এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সর্বতোমুখী ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। আর বৈদেশিক ক্ষেত্রে এই ভূমিকাই গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে এশিয়া-আফ্রিকা তথা বিশ্বের ইতিহাসের ধারার উপরে।

সাত

সরকারী নীতিতে প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের ধারা কিন্তু শুধু বৈদেশিক ক্ষেত্রেই আবদ্ধ রইল না; এই ধারার সংক্রমণ ঘটল অর্থনৈতিক নীতির ক্ষেত্রেও। গোড়ার বছরগুলিতে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ছিল অত্যন্ত

ভীরু ও দুর্বল। সে সময়ে ধনিক শ্রেণীর, বিশেষত ধনিক চূড়ামণিদের বাসনাটা ছিল একদিকে নবলব্ধ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার জোরে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপস রফা করে, আর অন্যদিকে দেশের ভিতরে দাম, জোগান, বাজার, নিয়ন্ত্রণ, বিনিয়ন্ত্রণ ইত্যাদির ব্যাপক কারচুপির মাধ্যমে গোটা অর্থনীতিটাকেই বিপর্যস্ত করে দিয়ে একেবারে লুটেপুটে খাওয়া। সরকারী নীতিটা ছিল এই বিকৃত বাসনার কার্যত সহায়ক।

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পররাষ্ট্র নীতি আর সাম্রাজ্যবাদী দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল আভ্যন্তরীণ নীতি—এ দুয়েরই বেশিদিন ধরে একসঙ্গে চলাটা সম্ভবপর ছিল না। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে অবশ্য উপরোক্ত দুর্বল নীতিই প্রতিফলিত হয়েছিল। বহিরঙ্গ ও ঘোষণার দিক দিয়ে অনেক প্রগতিশীলতা সত্ত্বেও আধা-ঔপনিবেশিক অর্থনীতির সঙ্কীর্ণ ও পশ্চাদ্‌পদ কাঠামো থেকে বেরনোর কোনো পথের সন্ধান এ পরিকল্পনায় পাওয়া যায় নি।

কমিউনিস্ট পার্টির ১৯৫১ সালে গৃহীত কর্মসূচীতে অবশ্য এ পরিকল্পনাকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ পরিকল্পনার অঙ্গ বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটি ছিল উল্টো রকমের। সে-সময়কার সরকারী নীতির মৌলিক দুর্বলতা সত্ত্বেও এটা সরকারী নেতাদের কৃতিত্ব যে, যুদ্ধ-অর্থনীতি ও তার সংশ্লিষ্ট কার্যক্রমের সঙ্গে ভারতকে গাঁটছড়ায় বেঁধে ফেলার সাম্রাজ্যবাদী ফন্দীটিকে তাঁরা ব্যর্থ করে দিয়েছিলেন। বরং চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ কারখানা, হিন্দুস্থান মেশিন টুল কারখানা, বড় বড় জল-বিদ্যুৎ কেন্দ্রাদিতে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনের পথে প্রথম দ্বিধান্বিত পদক্ষেপের মৃদু আভাস পাওয়া যায়। আর ঐ একই সময়ে বিভিন্ন রাজ্যে পুরনো ধরনের জমিদারী ও মধ্যস্বত্ব অবসানের জন্য আইন রচনাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এই পদক্ষেপ দ্রুত ও দৃঢ় হয়ে উঠতে শুরু করল প্রথম যোজনার শেষ দিক থেকে। ঔপনিবেশিক দায়ভাগের সঙ্গে দেশগঠনের জন্য জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার মূলগত বিরোধের তীব্রতা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন ও অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য বিদেশী ধনিকতন্ত্রের কাছ থেকে সাহায্য প্রাপ্তির আশাভঙ্গের তিক্ত অভিজ্ঞতা, সরকারী নীতির বিরুদ্ধে বামপন্থী মনোভাব ও গণ-আন্দোলনের দ্রুত প্রসার—এই সবের ধাক্কাতেই অর্থনৈতিক নীতিতে প্রগতি অভিমুখী পরিবর্তন এল।

১৯৫৫ সালে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্য ঘোষিত হল। এই একই সময়ে ব্রিটিশ মালিকানাধীন ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক ও কোলার স্বর্ণ খনির জাতীয়করণ, দেশী-বিদেশী জীবনবীমা কোম্পানিগুলিকে সরকারি সম্পত্তিতে রূপান্তর, ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে নতুন কোম্পানি আইন, এই সব রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন মালিক বা প্রাক্তন জমিদার, জায়গীরদারদের পক্ষ থেকে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ক্ষতিপূরণ হারের বিরুদ্ধে আদালতের দারস্থ হওয়া বন্ধ করার উদ্দেশ্যে সংবিধান সংশোধনাদি এই প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের সাক্ষ্য। আর এ সব ব্যবস্থা শুধু বিদেশী ধনকুবেরদের মনে নয়, এদেশের ধনিক শিরোমণিদের মনে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল তারই পরিচয় বিড়লার ইস্টার্ণ ইকনমিস্ট পত্রিকার মন্তব্য: "Events in last three months have left one in little doubt as to the determination of the Government of India to proceed on a reckless course."

কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের ভ্রূকুটি, অসন্তোষ ও এমন কি সরাসরি বিরোধিতা ও হস্তক্ষেপ (বিশ্ব ব্যাঙ্কের তদানীন্তন সভাপতি ইউজিন ব্ল্যাকের ভারতীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে লিখিত উদ্ধৃত চিঠিটি এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য) এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বৃহৎ পুঁজিপতিদের ওজর-আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে পরিবর্তনের এই ধারা অব্যাহত রইল। দ্রুত শিল্পায়ন, ভারী ও বুনিয়াদি শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের ব্যাপক প্রসার, কৃষিতে সমস্ত রকম মধ্যস্বত্বের অবসান, জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, প্রকৃত চাষীকে জমির মালিকানা দান, সমবায়মূলক তৎপরতার প্রসারাদির কর্মসূচী সম্বলিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গৃহীত ও চালু হল। স্থিতস্বার্থের চাপে কিছুটা দক্ষিণপন্থী সংশোধন সত্ত্বেও স্বাধীনতার অর্থনৈতিক ভিতকে মজবুত ও প্রসারিত করার এই কর্মসূচীটি তৃতীয় পরিকল্পনারও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ভারতের রাজনৈতিক জীবনে বাম ও প্রগতি-অভিমুখী পরিবর্তনের এই যে স্রোত তার সর্বোচ্চ অভিব্যক্তি একপক্ষে ১৯৫৯-এ কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে জমির সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ, কৃষি-সংস্কারের ধরন, প্রকৃত চাষীর মালিকানা ও সমবায়মূলক সহযোগিতানির্ভর গ্রামীণ সমাজ গঠন এবং খাদ্যশস্যে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্য প্রবর্তনের সঙ্কল্প গ্রহণ, আর অন্যপক্ষে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টির আবির্ভাব ও বিশেষত দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের

পর কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের প্রতিষ্ঠা। কোনো অতিরঞ্জন না করেই বলা যায়, এই শেষোক্ত বিকাশ শুধু কমিউনিস্ট ও বামপন্থী আন্দোলনের নয়, আমাদের দেশের জাতীয় আন্দোলনেরই স্বাধীনতা-পরবর্তী যুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তো ছিল—কিন্তু এই সর্বপ্রথম কোনো সরকার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের জাতীয় আন্দোলনের প্রতিশ্রুতি ও শ্রেষ্ঠ আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে আন্তরিকভাবে প্রয়াসী হল।

কিন্তু আন্তর্রাষ্ট্রীয় ও আভ্যন্তরীণ—এই উভয় ক্ষেত্রেই প্রগতিশীল গতিধারা এদেশের একচেটিয়া ধনকুবের ও অন্যান্য সমস্ত স্থিতস্বার্থকে ভীত-সন্ত্রস্ত করে তুলল এবং বামপন্থীর অগ্রগতি জাতীয় বুর্জোয়াকেও অতিরিক্ত রকমের দ্বিধাগ্রস্ত করে ফেলল। কেরালায় কমিউনিস্ট সরকারের অ-গণতান্ত্রিক উচ্ছেদ এর একটি প্রকাশ। আর জওহরলালের নেতৃত্বে ভারত সরকারের কার্যাবলীতে দেশী-বিদেশী স্থিতস্বার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সংগঠিত অভিব্যক্তি স্বতন্ত্র পার্টির গঠন। এরপর থেকেই কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির পক্ষ থেকে একটানা চেষ্টা চলল স্বাধীনতা-উত্তর কালের অগ্রগতির চাকাকে উল্টো দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য। আর এই প্রতি-বিপ্লবী প্রয়াসেরই উৎকট প্রকাশ দেখা গেছে চীনের ভারত-আক্রমণ পরবর্তী কয়েক মাসে রাজাজী-কৃপালনী-বাজপেয়ী-কারিয়াপ্পা-পাতিল-মোরারজীর অশুভ মিতালী ও কার্যকলাপে।

আট

উপরের আলোচনা থেকে অবশ্য গত পনেরো-ষোল বছরে ভারতের অগ্রগতিকে ধনতান্ত্রিক ভিন্ন অন্য কিছু মনে করলে গুরুতর ভুল হবে। তথাপি বর্তমান আলোচনায় যেটা তাৎপর্যের সেটা হল যে, অনেক অ-সমাধিত জটিল সমস্যা সত্ত্বেও জাতীয় সংহতি, সামাজিক প্রগতিমূলক ব্যবস্থা, প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান, জোট-নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি কিংবা স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ—এ সবই বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের উপাদান এবং এই হিসেবেই এ সবের অন্যতর মূল্য।

স্বাধীন ভারতে সামাজিক-রাজনৈতিক অগ্রগতির প্রকৃতি বিচারে অর্থনৈতিক বিকাশের মূল্যায়ন নিয়ে বিভ্রান্তি যেহেতু প্রচুর এবং সমাজ-বিকাশের শেষ পর্যন্ত নিয়ামক যেহেতু অর্থনৈতিক সম্পর্ক সে কারণেই এই

বিশেষ বিষয়ে একটু বিস্তারিত চর্চা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল যে, পূর্বে উল্লিখিত বিরোধ কটির বিস্তৃত পরিসরে এদেশে ধনতন্ত্রের বিকাশ বা আরও সঠিকভাবে বলতে হলে, রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র-এর (state capitalism) বিকাশ মূলত একটি প্রগতিশীল ধারা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

এই প্রগতিশীলতার পরিচয়, প্রথমত, শিল্পোন্নয়নের মূল কার্যক্রম অর্থাৎ ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পবিকাশের মধ্যে নিহিত। এই ধরনের শিল্পপ্রতিষ্ঠার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস এবং ত্বরান্বিত অর্থনৈতিক বিকাশের বনিয়াদ নির্মাণ।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণীর করায়ত্ত থাকা সত্ত্বেও এমন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ঘটছে যেটির অন্তর্বস্তু সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী। কারণ [ক] রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের কর্মসূচীর মূল বিষয়বস্তু ইস্পাত, পেট্রোলিয়ম বা ভারী রাসায়নিক জাতীয় শিল্পের বিকাশ, এবং [খ] এই বিকাশ প্রধানত সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের নিঃস্বার্থ, নিঃশর্ত ও অকুণ্ঠ সহযোগিতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট।

তৃতীয়ত, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার ও পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির একচেটিয়া প্রবণতা, বিশেষত ভারতীয় ধনিককুল-চূড়ামণিদের যথেচ্ছ কার্যকলাপ ও মুনাফাবাজির কেলেঙ্কারিকে পুরোপুরি না হলেও অন্তত অংশত সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার হাতিয়ার। আবাদী-কংগ্রেস প্রস্তাবিত সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ বা নেহরু-ঘোষিত সমাজতন্ত্রের প্রধান তাৎপর্যও এখানে। এই সব ঘোষণা যে বৈজ্ঞানিক অর্থে বা মার্কসীয় অর্থে সমাজতন্ত্র গঠনের কার্যক্রম নয় তা সুস্পষ্ট। কিন্তু ছোট-মাঝারি সমেত সমগ্র জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণীর আত্মবিকাশের প্রবল তাগিদ, সমগ্র শ্রেণীর স্বার্থে রাষ্ট্র কর্তৃক জাতীয় অর্থনীতির তত্ত্বাবধান, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন, বিভিন্ন রাজ্য ও অঞ্চলের সুসম বিকাশের আগ্রহ এবং উন্নয়নের ফলসমূহকে শাসক শ্রেণীর উপরতলার সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীটি কর্তৃক আত্মসাৎ করার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের আবশ্যকতা রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের বিস্তার, পরিকল্পিত উন্নয়ন ও সমাজতান্ত্রিক ধরনের সমাজ গঠনের ঘোষণার মধ্যে প্রতিফলিত।

চতুর্থত, নানা ফাঁক, ত্রুটি-বিচ্যুতি ও আপোষমুখিনতা সত্ত্বেও দেশীয় রাজ্যের সামন্ত-অধিপতি ও জমিদার, জায়গীরদার, তালুকদারদের রাজনৈতিক-

অর্থনৈতিক আধিপত্যের অবসান, কৃষি-সংস্কারের কর্মসূচীর মাধ্যমে সামন্ততান্ত্রিক শোষণের উৎকট রূপের সঙ্কোচন ও খর্বতা সাধন এবং কাশ্মীরের মত কোনো কোনো অঞ্চলে অত্যন্ত ব্যাপক ভূমি-সংস্কার উপরোক্ত প্রগতিশীল ধারার প্রকাশ।

স্পষ্টতই ভারতের এই ধনতান্ত্রিক বিকাশ বা রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র জাপান, জার্মানি বা প্রাক্-বিপ্লব রাশিয়া কিংবা আজকের ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো দেশের রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের প্রকৃতির থেকে মূলগতভাবে ভিন্ন। এই সব কয়টি ক্ষেত্রেই শুধু নিজ দেশের জনগণের উপর শোষণ ও অত্যাচারের নয়, অন্য দেশের জনসাধারণকেও লুণ্ঠনের, পররাজ্য গ্রাসের এবং ধনতান্ত্রিক অর্থনীতির অনিবার্য নিয়মে একচেটিয়াতন্ত্রের স্বৈরাচারী ও প্রতিক্রিয়াশীল বিকাশের হিসেবে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্রের আবির্ভাব। আর ভারতে ব্যাপারটা মূলগত অর্থেই বিপরীত—এখানে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র তথা বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক সমাজের বিকাশ ঘটছে অর্থনীতির জাতীয় পুনর্গঠন, ঔপনিবেশিকতার চক্রব্যূহের বিরুদ্ধে ধনিক শ্রেণী ও সমগ্র জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের বনিয়াদ সম্প্রসারণের হাতিয়ার হিসেবে।

বর্তমান আলোচনা প্রসঙ্গে একথা কিন্তু অবশ্য স্মর্তব্য, বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ভারতে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রগতিশীল ভূমিকা থাকলেও এটা শেষ পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক বিকাশ। মার্কসবাদ আজ অচল, এটা বর্তমানে অনেকেরই চালু বুলি। কিন্তু, টাকার আবির্ভাব গালে রক্তের ছাপ নিয়ে, আর পুঁজির আবির্ভাব পা থেকে মাথা অবধি রক্ত ও ক্লেদ মেখে, মার্কসের এই উক্তির সত্যতা শুধু আঠারো-উনিশ শতকী ইউরোপ-আমেরিকায় নয়, বিশ শতকের ষষ্ঠ দশকে এই 'সনাতন' ভারতেও বহাল রয়েছে। খাদ্যের জন্য মানুষে আর কুকুরে কাড়াকাড়ি, হাজার হাজার চাষীর জমি থেকে উচ্ছেদ, দু-মুঠো অন্নের দাবির জবাবে আশিটি তাজা মানুষকে খুন, অশ্রুতপূর্ব মুনাফার পাহাড়, সম্পদ উৎপাদকদের নরকতুল্য বস্তিতে বাস, স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণের নামে স্বর্ণশিল্পীমেধ, ক্ষুন্নিবৃত্তি কিংবা পড়ার খরচ চালানোর জন্য ব্লাড ব্যাঙ্কে-রক্ত বিক্রির প্রতিযোগিতা, গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর নির্বিচার দমননীতি, শ্রেণী স্বার্থে সংবিধান লঙ্ঘন—এ সবই ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, এ সবই ধনতান্ত্রিক সমাজের পরতে পরতে জমে ওঠা অমানুষিকতার পরিচয়।

এ বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই যে, এই ধারা যদি চলতে থাকে, অর্থ ও

পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ও একত্রীকরণ যদি অব্যাহত থাকে, ধনিকচূড়ামণিদের বর্ধমান ক্ষমতা যদি অনিয়ন্ত্রিত থাকে তবে অচিরেই ভারতের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ক্ষেত্র হয়ে উঠবে এদেশে চরম প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের ভিত্তি। সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ধনতন্ত্র হয়ে উঠবে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া ধনতন্ত্র ও একচেটিয়া ধনিককুলের সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণের হাতিয়ার। আর একচেটিয়া ধনিকদের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী মহাধনিকদের ঘনিষ্ঠ যোগসাজসের দরুন শুধু যে ভারতের স্বাধীন অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা জাতীয় স্বাধীনতা বানচাল হয়ে যাবে তা নয়, আসলে নয়া-উপনিবেশবাদ বা ঔপনিবেশিক ফ্যাসিবাদের আবির্ভাব ঘটবে তার সমস্ত বর্বরতা ও স্বৈরাচার নিয়ে। আর গত কিছু দিনে এই বিপদটি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

প্রতিক্রিয়া ও নয়া-উপনিবেশবাদের বিপদটি যে সম্প্রতি প্রবল হয়ে উঠেছে তার মূলে রয়েছে মার্কস-লেনিন-কথিত দ্বিতীয় পন্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের শক্তিশালী ঝোঁক। ব্রিটেনে ধনতন্ত্রের বিকাশ আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কস ক্যাপিটাল-এর তৃতীয় ভল্যুমে সিদ্ধান্ত করেছিলেন: 'The transition from the feudal mode of production is two-fold. The producer becomes merchant and capitalist....This is the really revolutionary way. Or else, the merchant establishes direct sway over production....This system presents everywhere an obstacle to the real capitalist mode of production....Without revolutionizing the mode of production, it only worsens the condition of the direct producers, turns them into the wage-workers and proletarians under conditions worse than those under the immediate control of capital, and appropriates their surplus-labour on the basis of the old mode of production." প্রথম পথের, নীচের থেকে উৎপাদক-মালিকদের উদ্যোগে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ক ও একচেটিয়া বণিকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে একেবারে গোড়া ঘেঁষে বুর্জোয়া বিপ্লবের দৃষ্টান্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ধনতান্ত্রিক বিকাশ। আর দ্বিতীয় পথ হল প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, তার সঙ্গে

আপোস করে উপর থেকে একচেটিয়া বণিকদেরই উদ্যোগে শিল্পের বিস্তার ও সামন্ত জমিদারদের ধনতান্ত্রিক জমিদারে রূপান্তর। প্রথম পথের তুলনায় অনেক বেশি মন্থর, স্বৈরাচারী ও যন্ত্রণাদায়ক এই দ্বিতীয় পথে ধনতন্ত্র বিকাশের নমুনা মেইজি-বিপ্লব-পরবর্তী জাপান, বিসমার্কের জার্মানি কিংবা স্টোলিপিনের রাশিয়া।

আজ ভারতে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়া যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে তার মধ্যে আসলে প্রকাশ পাচ্ছে ঐ দ্বিতীয় পন্থার চাপ। আর এই চাপের শিকড় রয়েছে ভারতীয় ধনিকদের জন্মগত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। এদেশে ধনিকতন্ত্রের প্রথম বিকাশ ঘটেছে ঔপনিবেশিক অর্থনীতির শ্বাসরোধকারী আবহাওয়ায়, দেশী মুৎসুদ্দি কারবারীদের উদ্যোগে। তাই ঠিকুজি-কোষ্ঠির হদিশ নিলে দেখা যায় আজকের ভারতের পাঁচটি বৃহত্তম ধনিক পরিবার—টাটা, বিড়লা, ওয়ালচাঁদ, মাহিন্দ্র ও মফতলালদের প্রত্যেকটিই দীর্ঘদিন ধরে নিজেদের ব্যাপৃত রেখেছিল শুধুমাত্র বাণিজ্য ও তেজারতির কারবারে। আর তাই ভারী শিল্পের সঙ্গে দীর্ঘদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পর এখনও টাটাদের অন্যতম প্রধান আয় আমদানি-রপ্তানি থেকে শুরু করে নানা রকমের ব্যবসায়ে।

ঔপনিবেশিক শাসনের নানা বিধি-নিষেধের বেড়াজালে এই ধনিকশ্রেণী জন্মক্ষণের বেদনা ও বাল্যের অভাববোধ পেয়েছে—কিন্তু যৌবনের শ্রী, স্বাস্থ্য কিংবা সবলতা পায় নি, তার আগেই জরা ও অবসাদ এদের গ্রাস করেছে। এই অবস্থায় এই ধনিকগোষ্ঠীর একমাত্র লক্ষ্য—শিল্পবিস্তার হোক চাই না হোক, কৃষির উন্নতি ঘটুক কি না ঘটুক—যে কোনও উপায়ে, যত তাড়াতাড়ি, বেশি বেশি মুনাফা অর্জন।

অবশ্য এদেশে চীনের মতো শুধু কম্প্র্যাডোর বা মুৎসুদ্দিকড়িয়া বুর্জোয়ার উদ্ভব হয় নি। এখানে বুর্জোয়াদের সর্বোচ্চ অংশের মধ্যেও তেজারতি-বণিক বৃত্তি আর শিল্পবিস্তারে আগ্রহ ও সামর্থ্য—এই দুয়েরই সমাবেশ ঘটেছে। আর ভারতীয় বুর্জোয়ার উপরোক্ত জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও দ্বৈত চরিত্রের প্রকাশ আমাদের দেশে ধনতন্ত্র বিকাশের ক্ষেত্রে দুই বিপরীত পথের কার্যক্রম ও সংঘর্ষের মধ্যে।

স্বাধীনতার আগে করাচী কংগ্রেসের 'মৌলিক অধিকার' বিষয়ক প্রস্তাব ("The state shall own or control heavy industries and services, mineral resources, railways, waterways, shipping and other means of public transport"), ১৯৩৬-এর জানুয়ারিতে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে

জওহরলালের সভাপতির ভাষণ, ঐ বছরেই ডিসেম্বরে ফৈজপুর কংগ্রেসে গৃহীত নির্বাচনী ইস্তাহার ও ব্যাপক গণতান্ত্রিক কর্মসূচী (এই কর্মসূচীর মধ্যে ছিল "...removal of British Imperialistic exploitation and a radical change in the antiquated and repressive land tenure and revenue systems"). ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির কার্যকলাপ কিংবা স্বাধীনতার পর ১৯৪৭-এর নভেম্বরে এ. আই. সি. সি.র দিল্লী অধিবেশনের প্রস্তাব, কংগ্রেস কৃষি সংস্কার কমিটির সিদ্ধান্তাবলী, অধ্যাপক মহলানবীশের 'পরিকল্পনা-কাঠামো', ঐ বিষয়েই পরিকল্পনা কমিশনের অর্থনীতিবিদদের প্যানেলের সুপারিশ (ব্যাঙ্ক ব্যবসা ও আমদানি-রপ্তানির উপর ব্যাপক নিয়ন্ত্রণ, খনি শিল্পে রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যের প্রবর্তনাদি এই সুপারিশগুলির অন্যতম), ভূমি-সংস্কার প্যানেলের সুপারিশ বা নাগপুর কংগ্রেসের প্রস্তাবাদিতে এই প্রথম পন্থায় ধনতান্ত্রিক বিকাশের বা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কর্মসূচী রচনা করা হয়েছে।

কিন্তু জাতীয় বুর্জোয়ার দ্বয়বাদী ভূমিকা, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ উপরতলার সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষণের দরুন দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের ঝোঁক এদেশে অত্যন্ত প্রবল। বাস্তবিকপক্ষে কংগ্রেসের ভিতরে-বাইরে প্রথম পথের প্রতি বিরোধিতা গোড়ার থেকেই। এ কারণেই করাচী কংগ্রেসের প্রস্তাব, স্বতন্ত্র রাজনীতির অন্যতম প্রবক্তা কে. এম. মুন্সীর ভাষায়, "ধনিক শ্রেণীকে স্তম্ভিত করেছিল।" এ কারণেই কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে জওহরলাল ও তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে ১৯৩৬-এর জুনে 'মৌলিক প্রকৃতি'র মতপার্থক্য জ্ঞাপন করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একসঙ্গে পদত্যাগ করেছিলেন প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, কৃপালনী প্রমুখ। এ কারণেই, ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি প্রসঙ্গে জওহরলাল লিখেছেন, "Important elements in the Congress...rather looked upon it as an unwanted child... and rather suspicious of its future activities. Big Business was definitely apprehensive and critical...."

স্বাধীনতা পাওয়ার পরে এই দুই পথের সংঘাত আরও বেশি তীব্র হয়েছে। কংগ্রেসের ভিতরে অতীতে প্যাটেলের সঙ্গে নেহরু-আজাদদের মতপার্থক্য বা

কংগ্রেস সভাপতিরূপে ট্যাণ্ডনের নির্বাচনকে উপলক্ষ করে সংঘাত ও পরে নেহরুর উদ্যোগে কংগ্রেস নেতৃত্বের পুনর্গঠন কিংবা সম্প্রতি জওহরলাল, কৃষ্ণ মেনন, কেশবদেব মালব্য, গুলজারিলাল নন্দ প্রমুখর সঙ্গে পাতিল-মোরারজি-অতুল্য ঘোষদের সুস্পষ্ট বিরোধ, আর নেহরুর নীতি ও নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ-সোস্যালিস্ট-আকালি-ডি. এম. কে. পার্টিদের অপবিত্র মিলন ও বিষাক্ত আক্রমণ এই সংঘাতেরই অভিব্যক্তি।

আমাদের প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে জাতীয় বিপ্লবাত্মক সাধনার যা কিছু অভীষ্ট এবং বর্তমানেও জাতীয় জীবনে ও সরকারী নীতিতে যা কিছু সুস্থ, গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল সে সবেরই বিরুদ্ধে এদের দেশদ্রোহাত্মক চক্রান্ত উদ্যত। আভ্যন্তরীণ নীতির ক্ষেত্রে পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ভারী ও বুনিয়াদী শিল্পের বিকাশ, রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রের প্রসার, কৃষির ব্যাপক প্রসার, সমবায়মূলক তৎপরতা—এ সবই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ, তাদের আশীর্বাদ-ও -প্রসাদপুষ্ট দেশীয় কায়েমী স্বার্থ এবং তাদের উপরোক্ত রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের প্রকাশ্য ও চোরাগোপ্তা আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যবস্তু। বৈদেশিক ক্ষেত্রে জোট-নিরপেক্ষতার নীতি, সামরিক জোটের আশ্রয় অবলম্বনে অস্বীকৃতি, দেশে দেশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সৌভ্রাত্র্য জ্ঞাপন, সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সোচ্চার ঘোষণা, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে সহযোগিতার নীতির বিরুদ্ধে এরা খড়্গহস্ত। বিদেশী মহা-ধনিকদের সঙ্গে মিতালি করে ব্যক্তিগত মালিকানায় শিল্প-বিস্তার, বড় জোতের মালিক ও প্রাক্তন জমিদারদের উপর নির্ভর করে বৃহদায়তন ধনতান্ত্রিক খামার গঠন, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ সাধন এবং সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পোষকতা, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র সম্পর্কে জনমানসে সংশয় ও অবিশ্বাস সৃষ্টি এবং সমস্ত গণতান্ত্রিক, প্রগতিশীল ও দেশপ্রেমিক শক্তির বিরুদ্ধে নিরঙ্কুশ সন্ত্রাস—এই হল দ্বিতীয় পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশের প্রতি-বিপ্লবী কর্মসূচী।

এই দ্বিতীয় পথের প্রবল চাপের সামনে জওহরলাল ও তাঁর সমর্থকদের দ্বিধা ও স্ব-বিরোধিতা এবং কমিউনিস্ট পার্টি ও অন্য বামপন্থীদের বিভ্রম ও দুর্বলতা আর উপযুক্ত জাতীয় সমাবেশের অভাব ইত্যাদি মিলিয়ে, প্রথম পথ পিছু হঠেছে অনেক ক্ষেত্রেই এবং অনুসৃত হয়েছে মধ্য-পন্থা। মধ্য পথ অনুসরণে নেহরু ও তাঁর অনুগামীদের আশা থেকেছে যে, এইভাবেই দ্বিতীয়

পথের ধ্বজাধারীদের অপকৌশলকে পরাস্ত করা যাবে। কিন্তু, কৃষি-অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সম্পর্ককে অংশত বজায় রেখে, সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে কৃষির বিকাশের প্রয়াস সংকট ও অসঙ্গতি নিরসনের পরিবর্তে সেগুলিকে আরও ঘনীভূত করে তুলেছে। এই দুর্বল প্রয়াসই গ্রামাঞ্চলের সামাজিক-রাজনৈতিক জীবনে বড় জোতের মালিক, বড় বড় কারবারী ও মহাজনের আধিপত্যকে সর্বময় করে তুলেছে। সরকারী আমলাদের সঙ্গে যোগসাজস এবং শহরাঞ্চলের একচেটিয়া কারবারী ও ফাটকাবাজদের সঙ্গে গাঁটছড়ায় আবদ্ধ ঐ তিন দুষ্টগ্রহই গ্রামাঞ্চলে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার প্রধানতম ভিত্তি। আর ভারতের মতো দেশে, যে দেশে কৃষি সমস্যাই অর্থনীতির মৌলিক সমস্যা, কৃষি সংকট সমাধানে অক্ষমতা ও পরিবর্তে উপরোক্তরূপ বিকাশের পশ্চাৎপটে সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি ও ম্যানেজিং এজেন্সি প্রথাকে বহাল রেখে, একচেটিয়া পুঁজিকে নানাবিধ কনসেশন দিয়ে, আমলাতন্ত্রের উপর নির্ভর করে শিল্প-বিস্তারের প্রয়াস একদিকে জনসাধারণের উপর বর্বর শোষণের বোঝা চাপিয়েছে, আর অন্যদিকে শিল্প-অর্থ-বাণিজ্য, মায় সংবাদপত্র জগতে এক কি দেড় ডজন পরিবারের একচেটিয়া আধিপত্য কায়েম করার সুযোগ করে দিয়েছে।

কিন্তু এ পথে অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবন তথা ব্যাপকতর ও গভীরতর অর্থে সুস্থ, সবল জাতীয় অগ্রগতি দুরাশামাত্র। উপরে বর্ণিত প্রক্রিয়ার পরিণামে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপরতলায় যে একচেটিয়া ধনিক চক্রটি গেড়ে বসেছে, মার্কসের ভাষায়, সেটি "...in its mode of acquisition as well as in its pleasures, is nothing but the *rebirth of the lumpenproletariat on the height of bourgeois society*" (বাঁকা হরফ মূলের)। এই প্রক্রিয়ারই অপার মহিমায় সামাজিক ও নৈতিক জীবন অধঃপতিত, সাহিত্যসৃষ্টি নগদমূল্যের বিনিময়ে দেশী-বিদেশী কুবেরদের সেবায় পর্যবসিত, নারীহরণ থেকে শুরু করে ক্রিশ্চিন কীলার পর্যন্ত যাবতীয় কিস্‌সা কাহিনী 'স্বাধীন' সাংবাদিকতার প্রধান উপজীব্য, আর রাজনৈতিক জীবন নীতি ও আদর্শভ্রষ্টতায় পঙ্কিল। এখানে ফ্রী এন্টারপ্রাইজের অর্থ সীমাহীন মুনাফার লালসা। আর এই লালসাকে তৃপ্ত করার জন্য টাকা ছুটেছে ইস্পাত, মেশিন নির্মাণ, ভারী রাসায়নিক শিল্পের থেকে চিনি, কাপড় বা রেয়ন কলের দিকে, আবার সেখান থেকে ব্যবসা ও ফাটকাবাজির দিকে, আর সেখানেও

সন্তুষ্ট না হয়ে কালোবাজারের দিকে। এই মহাধনিকচক্রের জীবনযাত্রায় ম্যাক্সওয়েবার কথিত capitalistic spirit ও তার অভিব্যক্তি সংযত, ভোগবিলাসকুণ্ঠ আচরণ, নিরন্তর উদ্ভাবনী প্রয়াস ও সক্রিয় শিল্পোদ্যোগ অনুপস্থিত ; পরিবর্তে অনুৎপাদক ব্যয়ের উদ্দামতা ও জাঁকালো সম্ভোগের বেলেল্লাপনাটাই বৈশিষ্ট্য।

এই পরিস্থিতি প্রত্যক্ষভাবে দুই ধরনের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করছে। একদিকে, সাধারণভাবে ধনতান্ত্রিক বিকাশের মধ্যে, বিশেষত দ্বিতীয় পন্থায় বিকাশের এই প্রক্রিয়ার মধ্যে যে বর্বরতা ও অমানুষিকতা রয়েছে তা জনসাধারণের ব্যাপকতম অংশের মধ্যে অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গতভাবেই তীব্র নৈরাশ্য ও প্রচণ্ড ক্রোধ সঞ্চারিত করছে, এবং তা এদেশের বিশেষ পরিস্থিতিতে এমন এক সঙ্কীর্ণ ও অতি-বামপন্থী রাজনৈতিক ধারার জন্ম দিচ্ছে যা পরিণামে বন্ধ্যা, লক্ষ্যভ্রষ্ট ও আত্মঘাতী। অন্যপক্ষে, উপরোক্ত ধরনের ধনতান্ত্রিক বিকাশই কিন্তু বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াকে পুষ্টি ও সাহস জোগাচ্ছে। আর রাজনৈতিক জীবনে এই ধারা দুটি আপাতদৃষ্টিতে পরস্পর-বিপরীত হলেও কার্যত অবশ্য নেহরুর মধ্য-পন্থাকেও বিপন্ন করছে।

উপরে বর্ণিত দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটিকে বিশদ করলে বলা যায়, ইতিপূর্বে ১৯৪৭-৫০-এর পর্বে যে সাম্রাজ্যবাদী, প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্র সাময়িকভাবে পরাজয় বরণ করে মুখ লুকিয়েছিল, কৃষি অর্থনীতি থেকে শুরু করে উপরে বর্ণিত পুরো জটটিকে অবলম্বন করে, সম্প্রতিকালে সেই প্রতি-বিপ্লব আবার তার বিষাক্ত নখ-দন্ত বিস্তার করছে। আর মহা-ধনিক চক্রটি এই প্রতিক্রিয়ার মেরুদণ্ড। যে মীরজাফরী কর্মসূচীটির কথা একটু আগে উল্লেখ করা হয়েছে সেটির বাস্তব রূপায়নের কলা-কৌশল হিসেবে, প্রথমত, সরকারী নীতির জন-বিরোধী দিক ও নিজেদের মুনাফালোভী কার্যকলাপের ফলস্বরূপ জনসাধারণের দুর্দশা, গভীর নৈরাশ্য ও ন্যায়সঙ্গত অসন্তোষকে এবং নিজেদেরই তৈরি রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক অরাজকতাকে এরা কাজে লাগাচ্ছে। নিজেদের নোংরা মতলব হাঁসিলের ব্যাপারে এদের দ্বিতীয় অপকৌশল হল কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলদের মধ্যে সুপরিকল্পিত যোগসাজস। কংগ্রেসের বাইরে থেকে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদ, দেশী কায়েমীস্বার্থ ও তাদের রাজনৈতিক প্রতিনিধি—স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ, প্রজা

সোশ্যালিস্ট, আকালি পার্টিরা হল্লা জুড়ে দেয়, আর সেই সুযোগে কংগ্রেস ও সরকারের ভিতরে গুরুত্বপূর্ণ স্থানে শক্তভাবে গেড়ে বসা দক্ষিণপন্থীরা সমর্থন ও সক্রিয় সাহায্য জোগায় এবং প্রগতিশীল নীতি ও শক্তিগুলির বিরুদ্ধে আঘাত হানে। আর এই পরিস্থিতি ও শক্তিবিন্যাসই অনেক ক্ষেত্রেই সরকারী নীতিতে দক্ষিণগামী পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

এছাড়া

এই বিপজ্জনক প্রতিক্রিয়াশীল প্রক্রিয়াটিই অভূতপূর্ব শক্তি লাভ করেছে চীন সরকারের হঠকারী আচরণজনিত পরিস্থিতির' থেকে। কৃষ্ণ মেননের অপসারণ দিয়ে এদের সাফল্যের শুরু ; তারপর ঘটেছে সরকারের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতিতে ধাপে ধাপে দক্ষিণপন্থার দিকে সর্বনাশা পরিবর্তন, মালব্যর অপসারণ, লোহিয়া-মাসানী-কৃপালনীদের উপনির্বাচনে জয়। এই সব পরিবর্তন ঘটেছে বিভিন্ন শ্রেণী ও সামাজিক শক্তির মধ্যে তীব্র সংঘাতের আবহাওয়ায়। কলম্বো প্রস্তাব, কাশ্মীরের ভবিষ্যৎ, চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসার ব্যাপারে শান্তিপূর্ণ আলোচনার নীতি, সাম্রাজ্যবাদী দেশ থেকে সৈন্য আমদানি, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ইত্যাদির মতো বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই এই শ্রেণী-সংগ্রাম আবর্তিত হয়েছে। কলম্বো প্রস্তাব তথা শান্তিপূর্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে চীন-ভারত বিরোধ মীমাংসা, পরিকল্পিত অর্থনৈতিক উন্নয়ন, জাতীয় ও রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিরক্ষা শিল্পের বিকাশ, সমাজতান্ত্রিক জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ইত্যাদি যা কিছু দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সংহত করার পক্ষে সহায়ক তারই তীব্র বিরোধিতা করেছে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদ ও দেশের ভিতরে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার শক্তি। এরাই ঘোষণা করেছে যে, জোট-নিরপেক্ষতার নীতি মৃত ; এবারে শুধু স্থির করা প্রয়োজন সমাধি-ফলকে কী লেখা হবে। দেশের আঞ্চলিক অখণ্ডতার এই ধ্বজাধারীরাই পাকিস্তানের হাতে কাশ্মীর তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছে ; এরাই 'বিমান-ছত্র', ভয়েস অব আমেরিকার সঙ্গে আকাশ-বাণীর চুক্তি ফেরি করেছে।

এই জটিল, গুরুতর পরিস্থিতিতে সমস্ত গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল শক্তিকে গ্রহণ করতে হয়েছে আত্মরক্ষামূলক ভূমিকা। কিন্তু এ ভূমিকা, বিশেষত সরকারী নীতির দক্ষিণ-অভিমুখী পরিবর্তনের প্রবণতা সত্ত্বেও এটা তাৎপর্যপূর্ণ যে, শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত প্রখর শ্রেণী ও নীতিগত সংগ্রামের পর

দেশী-বিদেশী প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে প্রতিহত করা গেছে এবং বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির মৌলিক, প্রগতিশীল উপাদানগুলিকে রক্ষা করা সম্ভবপর হয়েছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকে কলম্বো প্রস্তাব গ্রহণ, অর্থনৈতিক বিকাশের মূল দিকগুলির অনুসরণ, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ইত্যাদিই দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রগতিশীল, জাতীয় শক্তিগুলির শক্তি ও সামর্থ্যের নিদর্শন। আর এজন্য জওহরলাল ও তাঁর সহযোদ্ধাদের কৃতিত্ব ও অবদান অনস্বীকার্য।

দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীলদের আশা অবশ্য অনেক। সরকারী নীতির অন্তর্নিহিত দৌর্বল্য ও কংগ্রেসী নেতৃত্বের আপোসমুখী মনোভাবের পটভূমিতে একবার রক্তের কিছু স্বাদ পেয়েই এরা আরও দুঃসাহসী হয়ে ওঠে। এরা দাবি করতে শুরু করে বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির আরও দক্ষিণমুখী পরিবর্তন, সরকারের দক্ষিণপন্থী পুনর্গঠন এবং এমন কি নেহরুরও অপসারণ। আর এই অভিসন্ধি পূরণের উদ্দেশ্যেই দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ থেকে জোটবদ্ধভাবে অনাস্থা প্রস্তাবের উত্থাপন। আশাটা ছিল এর মধ্যে দিয়েই এরা দেশের সামনে নিজেদেরকে বিকল্প নেতৃত্ব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

কিন্তু এ-সাধ ছিল সাধ্যের অনেক বেশি। অনাস্থা প্রস্তাব হেরে তো গেলই, উপরন্তু তাদের সহ্য করতে হল সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত আঘাত। অনাস্থা প্রস্তাবের উপর বিতর্ক হয়ে যাওয়ার পর সকলের নজর ছিল কামরাজ পরিকল্পনা ও তার রূপায়নের দিকে। দেখা গেল, এ পরিকল্পনার ধাক্কায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভিতরে দক্ষিণপন্থার প্রধানতম দুই স্তম্ভ মোরারজি দেশাই ও সদাশিবরাও পাতিলকে সরে পড়তে হল এবং সেই সঙ্গেই প্রাক্তন অর্থমন্ত্রীর আপৎকালে অবলম্বিত অর্থনৈতিক নীতির জঘন্যতম দুটি ব্যবস্থা—বাধ্যতামূলক সঞ্চয় প্রকল্প ও স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থারও ব্যাপক পরিবর্তন ঘটল। এখনও অবশ্য সব কিছুই প্রাথমিক স্তরে রয়ে গেছে। কিন্তু সব মিলিয়ে কামরাজ পরিকল্পনা, দেশের ভিতরে ফ্যাসিস্ত প্রবণতার বিরুদ্ধে নেহরুর সতর্কবাণী, 'গদির আগে পার্টি'—এই নীতির ঘোষণা ও এ-ঘোষণার বাস্তব রূপায়নের মধ্যে জওহরলাল ও তাঁর সমর্থকদের অর্থাৎ কংগ্রেসের ভিতরকার প্রগতিশীল শক্তির আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম পাল্টা আক্রমণের আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

অবশ্য দ্বিধা এখনও রয়েছে। দক্ষিণপন্থীরাও যথেষ্ট শক্তিশালী—ফলে আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন ঘটানো সহজ বা সরল নয়। কিন্তু, মনে রাখা দরকার যে, সারা দেশেই শুরু হয়েছে প্রগতিশীল আন্দোলনের নতুন পালা। তারই পরিচয় কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে মহা-আবেদনপত্রে স্বাক্ষর সংগ্রহ ও ১৩ই সেপ্টেম্বরের অবিস্মরণীয় দিল্লী অভিযান। দলগত সংস্কারের সঙ্কীর্ণ ভেদবুদ্ধির প্রাচীরকে অতিক্রম করে, প্রায় সমস্ত শ্রেণী ও অংশ—শিল্প-শ্রমিক, কৃষি-শ্রমিক, ছোট-বড় মালিক চাষী, শহুরে মধ্যবিত্ত, ধনিক শ্রেণীরও অংশবিশেষ, বুদ্ধিজীবী, সরকারী কর্মচারী ইত্যাদিকে ব্যাপ্ত করে, দেশের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত জুড়ে, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নীতিগত বিষয়ে এমন সংগঠিত, সম্মিলিত আলোড়ন-অভিযান স্বাধীনতা পাওয়ার পরবর্তী ষোল বছরে আর কখনও হয় নি। এই অভিযানের ব্যাপ্তি ও জাতীয় প্রকৃতি প্রাক্-স্বাধীনতা পর্বে বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম দশকের জাতীয় আন্দোলনের গৌরবময় দিনগুলির কথাই মনে করিয়ে দেয়। বাস্তবিকপক্ষে গত আগস্ট-সেপ্টেম্বরের অভিযান আর স্বাধীনতা পাওয়ার আগেকার আন্দোলনগুলির মধ্যে একটা নিবিড়, গভীর যোগসূত্র বিদ্যমান। এই শেষোক্ত আন্দোলনগুলির উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন, আর সর্বশেষ জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বের সংরক্ষণ ও প্রসারসাধন অর্থাৎ ১৯৪৭-এর রাজনৈতিক বিপ্লবের সংহতিসাধন। সেই হিসেবে এই অভিযানটি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্যেরই অনুবৃত্তি—কিন্তু নতুন পটভূমিতে, নতুন স্তরে অনুবৃত্তি। আর কামরাজ পরিকল্পনায় দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে যে প্রত্যাক্রমণের সূচনা তাকেই আরও একধাপ এগিয়ে দেওয়া হয়েছে এই অভিযানে। নিঃসন্দেহেই এই ঐতিহাসিক অভিযানের মধ্যে রূপ পেয়েছে গোষ্ঠী-নিরপেক্ষতা, স্বাধীন অর্থনৈতিক বিকাশ ও সমাজতন্ত্রের প্রতি সংগঠিত সমর্থন, এবং এই সঙ্গেই আবার সরকারের জন-বিরোধী নীতি ও সর্বোপরি, দক্ষিণপন্থীদের প্রতি-বিপ্লবী ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দেশবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ রচনার প্রয়াস।

এই প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে পরাস্ত করাটাই জাতীয় অগ্রগতি তথা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, সামন্ততন্ত্র-বিরোধী, গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সফল পরিসমাপ্তির জন্য যথেষ্ট নয়। প্রকৃতপক্ষে প্রথম পথে ধনতান্ত্রিক বিকাশও সাধারণভাবে

স্ববিরোধিতাপূর্ণ, এবং আমাদের দেশের বিশেষ ঐতিহাসিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে গোড়ার থেকেই উৎকট রকমের জন-বিরোধী, গণতন্ত্র-বিরোধী, প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানকে জন্ম দিতে বাধ্য। এই পরিস্থিতিতে প্রথম পথের বিকাশটিকে একমাত্র জাতীয় গণতন্ত্র ও অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের দিকে ঘুরিয়ে দিতে পারলেই সামাজিক-অর্থনৈতিক পুনরুজ্জীবনকে নিশ্চিত করা যায়, জাতীয় অগ্রগতিকে নির্বিঘ্ন করা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে সিদ্ধিলাভের জন্য সরকারের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক নীতির বাম-অভিমুখী পরিবর্তন অর্জন, এবং, সবথেকে বড় কথা হল, দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার ষড়যন্ত্রকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত ও বিধ্বস্ত করাটাই বর্তমান মুহূর্তের সর্বাপেক্ষা বেশি জরুরী কর্তব্য।

এই কর্তব্যের সমাধান অবশ্য মোটেই সহজ নয়। কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে প্রতিক্রিয়াশীলেরা প্রথম আক্রমণের আঘাত সামলে নিয়ে জোট বাঁধছে। বিভিন্ন শ্রেণী ও রাজনৈতিক শক্তির সংগ্রাম আরও তীব্র হচ্ছে। জওহরলাল ও তাঁর অনুগামীদের নীতি ও প্রয়াসও এখনও দুর্বলতা ও অন্তর্বিরোধিতা থেকে মুক্ত নয়। এ কারণেই সমস্ত দেশপ্রেমিক ও গণতান্ত্রিক শক্তির আশু কাজ হল সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের নতুন ধারাটিকে অব্যাহত রাখা, প্রসারিত করা ও আরও শক্তিশালী করা। গণ-সংগ্রামের নিরবচ্ছিন্ন উত্তরোত্তর বিকাশ এবং সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্রের বিরোধী সমস্ত শক্তিকে ব্যাপ্ত করে গণ-সংগ্রামে নতুন ব্যাপকতা ও গভীরতা আনয়ন অভিপ্রেত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অপরিহার্য পূর্বশর্ত। এই জাতীয়, গণতান্ত্রিক সম্মিলনের বিশেষ অর্থ ও অন্তর্বস্তু হল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষকসাধারণের নতুন ধরনের মৈত্রীবন্ধন। এ-কাজ সম্পাদনে ব্যর্থতাই গত পনেরো-ষোলো বছরে ভারতের বামপন্থী ও প্রগতিশীল সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধানতম ও মূলগত দুর্বলতা।

সম্প্রতিকালে প্রগতিশীল শক্তিগুলির মধ্যে নতুন ধরনের বিপ্লবী ঐক্য রচনা এবং রাজনৈতিক তৎপরতাকে গুণগত অর্থেই নতুন স্তরে উন্নীত করার সম্ভাবনা উন্মুক্ত হয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে কংগ্রেসের ভিতরকার গণতান্ত্রিক শক্তি এবং কমিউনিস্ট পার্টির। কংগ্রেসের রয়েছে সেই ১৮৮৫ সাল থেকে শুরু করে জাতীয় চেতনা ও আন্দোলনের দীর্ঘদিনের গৌরবময় ঐতিহ্য, আর কমিউনিস্ট

পার্টি আগামী দিনের মহত্তম ভবিষ্যতের প্রতীক। স্বভাবতই আজকের যুগসন্ধিক্ষণে জরুরী প্রয়োজন এই দুটি প্রগতিশীল ধারার ঐক্য এবং সেই সঙ্গে সমস্ত জাতীয়, গণতান্ত্রিক, দেশপ্রেমিক, প্রগতিশীল শক্তির মধ্যে মিলনের সেতুবন্ধন। আর এই জাতীয়, গণতান্ত্রিক সম্মিলনকে নিজেদের পতাকায় লিখে নিতে হবে সাম্রাজ্যবাদ ও দক্ষিণপন্থীদের প্রতি-বিপ্লবী চক্রান্তকে এদেশের বুক থেকে চিরতরে নির্মূল করার বিপ্লবী আহ্বান। এই আহ্বানকে জয়যুক্ত করে তোলার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও সামন্ততন্ত্র বিরোধী গণতান্ত্রিক বিপ্লবের কাজকে সমাধা করে অর্থাৎ আজকের আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরিস্থিতিতে জাতীয়, গণতান্ত্রিক বিপ্লব তথা অ-ধনতান্ত্রিক বিকাশের পথ বেয়ে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রগতির সম্ভাবনা।

গোপাল হালদার

রূপনারানের কূলে

(পূর্বান্থবৃত্তি)

গৃহশিল্পের কথা

সেজ জেঠামশায়কে আমি দীর্ঘদিন দেখেছি। মান্থষ হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য বুঝবারও অবসর পেয়েছি বেশি—স্নেহ ভালোবাসাও পেয়েছি প্রায় চল্লিশ বৎসর। অতি গম্ভীর প্রবল কণ্ঠ আর কারও দেখি নি—তাঁর দ্বিতীয় পুত্র রঙীনচন্দ্র হালদার কতকটা তা পেয়েছেন। তিনি কষ্টসহিষ্ণু, কর্মঠ লোক, দেহে স্থপটু, প্রকৃতিতে বেশ সাবধান। বাড়ির পুজোর বা ক্রিয়াকর্মের যত কষ্টকর কাজের ভার তিনি বহন করতেন। তাঁর বন্ধুরা বলতেন, প্রমদা ক্রিকেট খেলত ভালো। ব্যাট ধরলে সারা দিনে তাকে আউট করা যেত না। কিন্তু রান হয়তো হত ৭ বা ৮। প্রমদা জোরে মারবে না—সাবধান, কেবল ঠেকাবে। আসলে সাবধানতা ছিল তাঁর প্রথম নীতি। তাঁর সঙ্গে পুজোয় দু-একবার বাড়ি গিয়েছি। যেতে লাগত বিকাল থেকে পরদিন সকাল পর্যন্ত। তিনি কলা ছাড়া পথে কিছুই খেতে দেবেন না—খেলেই কলেরা হবে। বলতেন, "এক রাত্রি না খেয়ে কেউ মরে নি, কিন্তু খেয়ে মরেছে অনেক।" আমাদের খাদ্যমন্ত্রীরাও তো এ কথাই বলেন—না খেয়ে কেউ মরে না, মরে বরং খেয়েই। কারও কোথাও গতায়াতেই জেঠামশায়ের আপত্তি—কেন একটা বিপদ ডেকে আনা। দাদা যাঁর লেখাপড়া ফেলে নেপাল চলে গিয়েছিল এমন লোকের ভাই তিনি। কেউ যাবে শুনলেই নিষেধাজ্ঞা ধ্বনিত হত প্রবল কণ্ঠে "যেয়ো না, যেয়ো না বলছি।" তারপর, হতাশ কণ্ঠে "যাও আমার কথা না শুনে। টাকা-পয়সা খরচ করে যেতে পার, ফিরে আসবে এক পয়সায়" —তখনো পোস্টকার্ড এক পয়সা, আর 'ফিরে আসবে' অর্থাৎ এক পয়সার পোস্টকার্ডে আসবে মৃত্যুসংবাদ। এ রকম অদ্ভুত উদ্ভটের সঙ্গে তাঁর প্রকৃতিতে ছিল অন্যায়ের বিরুদ্ধে অদম্য প্রতিবাদ-প্রবণতা, দৃঢ় সংকল্প। সেখানে তাঁর

প্রবল কণ্ঠ গর্জে উঠত দুর্বার বিক্রমে আর অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায়। চমকে উঠতে হত সকলের। অথচ তিনি কলহপরায়ণ ছিলেন না। যে কাজ তিনি করতেন, সরকারী কান্থনগোর কাজ, তাতে বিনা চেষ্টাতেও যথেষ্ট অর্থাগম হতে পারত—যদি অর্থলাভের প্রবৃত্তি থাকে। কিন্তু সে পথ তাঁর পক্ষে ছিল অগ্রাহ্য, বেতনের অতিরিক্ত 'উপরি' তাঁর কাছে ঘৃণার্হ। অথচ ধর্ম ভক্তি প্রভৃতি নিয়েও তাঁর মাথাব্যথা বেশি ছিল না। আমার জেঠাইমা দীক্ষা নিয়েছিলেন ভোলানন্দ গিরি মহারাজের থেকে—তিনি স্বচ্ছন্দে তাতে সম্মতি দিলেন না। নিজে মন্ত্র নেবেন না—"একজন দুই প্রভুকে সেবা করতে পারে না। আমি সরকারী চাকরো।" আত্মীয়-কুটুম্বদের চিঠিপত্র এলে তা আর পড়ার অবসর হত না—মুখে শুনে নিতেন। তারা অন্থযোগ দিলে বলতেন "রেখে দাও এখন। পেনসেন নিয়ে উত্তর দোব।" পেনসেন নিয়েও তাঁর চিঠি লেখার অবসর হয় নি, দীক্ষা নেবারও না। মৃত্যু যখন অদূরে, ডাক্তারদের কথামতো বউদি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, "বাবা, কী খেতে চান?" দু-একবার জিজ্ঞাসা করাতে মৃদু হেসে বললেন, "পোলাউ-মাংসই করো তা হলে।" পরিবারটা একটু মাংসাশী এবং ভোজনপ্রিয়। তিনি তদুপরি ছিলেন খুঁতখুঁতে। অন্তত জেঠাইমার রন্ধনে খুঁত ধরতে না পারলে খাওয়ার পরে বলতেন, "দেখো এখন হজম করতে পার কিনা।"—যেন তাও রান্নার দোষ। অথচ মেজ জেঠাইমা ছিলেন রন্ধনে স্থপটু।

বাড়ির কনিষ্ঠ ভ্রাতার জ্যেষ্ঠ পুত্র আমি—তাই এঁদের সকলের স্নেহ আমি জন্মাবধি লাভ করেছি। সে সব মান্থষেরা এখন আর কেউ বড় নেই। অকৃতজ্ঞ হলেও তাঁদের ভোলা অসম্ভব। আমার স্মৃতি থেকেও অবশ্য কাল তাঁদের অনেক রেখা মুছে ফেলছে।

একটা মজার কথা প্রথম বলি। স্কুলে যখন প্রথম পড়তে যাই—বাড়ির সঙ্গেই ছিল সেই ইস্কুল—'বঙ্গবিদ্যালয়'—আমাকে শিক্ষকেরা একজন গল্পছলে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন, "ওরে, তোকে বাড়িতে সব থেকে বেশি ভালোবাসে কে?" বিশেষ চিন্তা করতে হল না। দ্বিতীয় বার "বল না" শুনতেই বললাম "ঠাকুর-মা।"

তিনি হাসলেন। বললেন, "কেন? মা নয়?"

আমি দ্বিধা না করে বললাম, "না।"

শিক্ষক মহাশয় ক্লাশ-সুদ্ধ সকলকে কথাটা শোনালেন। তাঁর সহযোগীদেরও দু-একজনকে আনালেন। বললেন, "শুনেছেন, ওকে নাকি ওর মা ভালোবাসেন না।"

তাঁরা যে কী আমোদ পেলেন জানি না, হাসতে লাগলেন। আমি কিন্তু ভাবছিলাম "সত্যাই তো, মা কি আর ঠাকুরমার মতো ভালোবাসেন—কিছুতেই না।"

কথাটা বাড়িতেও পৌঁছল, সবাই হাসলেন আবার—মাও পর্যন্ত স্মিত মুখে।

ঠাকুর-মা যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রায় ততদিন এ কথাও সত্য ছিল। কেবল শেষ বছরটা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে হারিয়ে সেই সত্তর-পেরুনো বৃদ্ধা শয্যাশায়িনী হয়েছিলেন।—বৎসর না ঘুরতেই অবশ্য তিনি শেষ নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন—সেই এক বৎসর তিনি আমারও খোঁজ নেন নি। না হলে আমি তো জানতাম—সব থেকে বেশি তিনি ভালোবাসেন আমাকে। অনেক দিন দুপুরে তাঁর কাছে ঘুমোতাম—না হলে মায়ের বিশ্রাম আমার দৌরাত্ম্যে অসম্ভব হত। ফলে অবশ্য অসম্ভব হত ঠাকুরমায়ের বিশ্রাম। কিন্তু তিনি বলতেন—"চল 'প্রস্তাব' বলব।" পূর্ব বাঙলায় রূপকথা-উপকথার নাম 'প্রস্তাব'। ঠাকুরমায়ের সেই ঝুলিটা তত রসসমৃদ্ধও ছিল না, বিশালও না, ছাপা বই দেখে এখন তা বুঝি। তখনো আপত্তি করতাম—"এটা জানি আরেকটা বলুন।" পরিমিত ছিল জোগান, কিন্তু অমৃত অমৃতই। ঠাকুরমা যে সব থেকে বেশি ভালোবাসেন, এ বোধহয় পৃথিবীর সকল শিশুর অভিজ্ঞতা। কিন্তু মনে হয় আমাদের বাড়িতে অন্যদের অপেক্ষা এ কথাটা জোর করে বলতে পারতাম আমরা দু-জন—তাঁর নাতিদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ 'সুদর্শন', আর তার বছর নয় পরেকার এই কনিষ্ঠ পুত্রের জ্যেষ্ঠ তনয়। ছোট্ট মানুষটি ঠাকুরমা, এককালে ছিলেন গৌরবর্ণা,—তা এখন বুঝি, তখন বিশেষ লক্ষ্য করি নি। নাক-মুখ-চোখ সুন্দর, তাও তখন দেখি নি। মানুষটিকেই দেখেছি—যাঁর কাছে ঠাঁই নিতে পারলে আর আমার দুষ্টোমির জন্য কারো শাসন সইতে হবে না। রাত্রি ভোর না হতে উঠে তিনি বাড়ির চারদিকে গোবর-জল ছিটিয়ে যান—সব শুদ্ধ হল। পূজার ফুল-পাতা সংগ্রহ করেন, ঘরদোর পরিষ্কার করেন। স্নান করে, নামাবলী গায়ে পুজোয় বসেন। পাশে বসে তাঁর শিবপূজা দেখতাম, তাঁর কাছে ঘেঁষা তখন নিষেধ—আমি অস্নাত। একটি-একটি করে বেলপাতা বেছে নেন—পোকা-কাটা পাতা বাতিল করেন।

রাঁধেন। পূজার শেষে তাঁর স্বহস্তে নিরামিষ রান্না—বাঙাল বাড়ির সে 'ঘুরিছ ঝোল' আশ্চর্য বস্তু! পাথরের থালা-বাসন থেকে এক-আধটুকু প্রসাদ না পেলে আমাদের চলত না। যতদূর জানি বৃদ্ধা জীবনে দুঃখই পেয়েছেন বেশি। অল্প বয়সেই স্বামী হারান তিনটি পুত্র ও একটি কন্যা নিয়ে। একান্নবর্তী পরিবারে আশ্রয়ের অভাব হয় নি, ব্যক্তিত্বের তবু ছাঁটকাট হয়। এর পরে একমাত্র কন্যা (আমার পিসিমা) মাত্র একটি শিশুকন্যা কোলে নিয়ে বিধবা হলেন। অবশ্য ছেলেরা বড় হয়ে প্রতিষ্ঠিত হলে ঠাকুরমায়ের অনেক দুঃখ মিটে গিয়েছিল। কিন্তু জীবনের শেষ বৎসরটি আবার পুত্রশোকে তা চূর্ণ হয়ে যায়। শিবপূজার কালে ঠাকুরমাকে দেখতাম—মাঝে-মাঝে কী অস্পষ্ট কথা বলে ক্রন্দনে ভেঙে পড়তেন। বুঝতাম না—কী বলেন, কেন তাঁর দুঃখ। পরে শুনেছি—বহু পূর্বে কে নাকি গণনা করে বলেছিলেন তাঁর ভাগ্যে পুত্রশোকের সম্ভাবনা। গণনা জিনিসটা তাঁদের দিনে বেশ ফলত, আমাদের দিনে দেখছি তার না-ফলাই বেশি। তবে এক-আধটা ব্যতিক্রমও দেখেছি—দাদা (রঙীন হালদার) সেবার ম্যাট্রিক দিচ্ছেন, তখন তাঁর কোষ্ঠী একজন ভদ্রলোককে দেখানো হয়। তিনি কিন্তু গণৎকার নন, ব্যাবসায়ে মোক্তার, কোষ্ঠীবিচার তাঁর বিনি-পয়সার খেলা—যাক, তিনি বলেছিলেন "শিক্ষা বিজ্ঞান এর কর্ম।" বাড়ির সকলের ইচ্ছা ছিল—পাশ যদি করে তবে এ ছেলে ওকালতিই করবে, হবে কাকার সহকর্মী। তাঁরা বললেন, "শিক্ষা!—মাস্টারি?" আর একটু পরীক্ষা করে ভদ্রলোক জানালেন, "না, আরও উচ্চতর শিক্ষা মনে হয়।" এবার সকলের উচ্চহাস্য। কারণ, আর যাই হোক, রঙীন হালদার মহাশয় স্কুল জীবনে (পরে কলেজ জীবনেও) পাঠ্য বইএর সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন সামান্য—ভালো পাশ করা অপেক্ষা একেবারে পাশ না করাও তাঁর পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় ছিল না। প্রসঙ্গক্রমে বলতে পারি—আমাদের অভিভাবকরা আমাদের দিয়েছিলেন চরম স্বাধীনতা—পড়া না-পড়ো যায় আসে না। কারণ, তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন—আমাদের কিছু হবে না। প্রতিবেশীদের ছেলেরা যে প্রত্যেকে 'ভালো ছেলে', তা তাদের পিতারা যেমন সজোরে বলতেন, আমাদের বাড়ির কর্তারাও ধ্রুব বলে তা জানাতেন। তেমনি তাচ্ছিল্যভরেই কর্তারা স্থির করে রেখেছিলেন, "আমাদের এগুলোর কিছু হবে না।" আমার কাল পর্যন্তও এর ব্যতিক্রম হয় নি। আমরাও জানতাম—আমাদের কিছু হবে না। অথচ পরে দেখলাম,

আমার ব্যাপারে তাঁদের ধারণা—শুনেছি পরবর্তীকালে রচিত কর-কোষ্ঠী গণনাও—মিথ্যা হয় নি, কিন্তু বাড়ির সকলের সম্বন্ধে তাই বলে তা সত্যও হয় নি—ম্যাট্রিক কেন, বি-এর দেউড়িও তো সকলেই পেরিয়ে গিয়েছি।—তারপরে কেউ কেউ আর জায়গা পাই নি জীবিকার রাজসভায়। আমি তো রোলিং স্টোন্। যাক্ সে কথা, কিন্তু আসল কথাটা এই, ভাগ্যগণনা জেনেই বা সেই বৃদ্ধা জননীর কী লাভ হল? দেবতার কাছে নিবেদন-ক্রন্দনও তো সফল্ হয় নি—পুত্রশোক তো পেলেনই। আর-একটি কথা বলে এখানেই ঠাকুরমায়ের কথা শেষ করি—তাঁর সেদিনের লক্ষ্মীর ঝুলি, হরীতকি কর্পূর প্রভৃতির কৌটো—রহস্যময় বস্তু থাক। আমার বিদ্যারম্ভের কালে প্রথম শিক্ষা হয়েছিল যেমন জেঠামশায়ের কাছে উঠোনে লেখা লিখে, আমার বাংলা-ইংরেজি হস্তলিপির দাগা-বুলোনোর কাজ হয়েছিল তেমনি ঠাকুরমায়ের সামনে—তিনি তা বসে বসে দেখতেন। মনে পড়ে ইংরেজি হস্তলিপি লিখছি—'পি', 'ও', 'এফ' প্রভৃতি অক্ষরগুলো যে মাত্রাচ্যুত তা ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধা লক্ষ্য করে ফেললেন—"এ কি, মাত্রা ছেড়ে গিয়েছে যে।" সগর্বে জানালাম "এ ইংরেজি লেখা,—বাঙলা নয় যে, তুমি বুঝবে।" আজ জানি, ইংরেজ জাতটা মাত্রাজ্ঞানে বলিষ্ঠ, কিন্তু সেদিন ঠাকুরমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম ওদের লেখা মাত্রা মানে না। হয়তো তাঁর বিবেচনায় তা সত্যই মনে হয়েছিল—এদেশে ইংরেজই রাজা তাদের মাত্রা মানতে হবে কেন! ঠাকুরমা ইংরেজি জানতেন না, নিঃসন্দেহ। বাঙলাই কি জানতেন? অনুমান করছি—উনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকের শেষে তাঁর জন্ম (১৮৪০ ইং একটু আগে বা পরে)। বিক্রমপুরে, ব্রাহ্মণগৃহের শিক্ষা তাঁদের যা হয়েছে—হয়েছে মুখে মুখে—হাতে-কলমে—কালি-কলমে নয়। তবে আমার হস্তলিপিতে দাগ-বুলানোর বেলা তিনিই ছিলেন আমার 'গাইড'—এটুকু বুদ্ধি ও শিক্ষা তাঁর ছিল।

মা ও জেঠাইমাদের কালে (জন্ম যাদের ১৮৭০-৮৫ ইং'র মধ্যে) বাঙলা লেখাপড়া-জানা নিয়ম হয়ে পড়েছিল। তাঁরা সবাই তা জানতেন। সম্ভবত পরিবারের গুণে ও শহরে বসবাসের ফলে বেশ তাঁরা পড়তেন—লিখতেনও। সেদিকে আমার সেজ জেঠাইমা বেশি উল্লেখযোগ্য। তিনি বেশ সুন্দরী ছিলেন, তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী ছিলেন বললেও হয় না। বিদ্যা যেটুকু বাল্যে লাভ

করে থাকুন তার চেয়ে বেশি ছিল তার বিদ্যানুরাগ ও রসবোধ, গ্রহণশক্তি। সর্বাপেক্ষা প্রধান কথা—তিনি ছিলেন ব্যক্তিত্ববতী। ছেলেমেয়েরা কেউ-কেউ তা কিছুটা লাভ করেছেন (যেমন, রঙীন হালদার, প্রফুল্ল হালদার, বোনদের মধ্যে দু-জনা—একজনা স্বর্গীয়া ডাঃ লক্ষ্মী হালদার)। সবাই নয়, সবটাও কেউই নয়। বাড়ির ব্যবস্থা আয়োজন তিনিই প্রায় সকলকিছু করতেন—করতে জানতেন, ও করতে পারতেন। ব্রত-পূজায় ব্রতকথা যা তিনি বলতেন তা অপরেরা শুনত—তাঁর ঘরেই প্রতিবেশিনীদের হত সমাগম—দুপুরে, আত্মীয় কুটুম্বদেরও তিনিই জানাতেন সমাদর, আপ্যায়ন গৃহকর্ত্রীরূপে। ও পাড়ার মহিলাদের মধ্যে ভাগ্যবতী অনেকে ছিলেন, বুদ্ধিমতী, গর্বিতাও। কিন্তু সেজ জেঠাইমার মতো সামাজিকতার সঙ্গে আত্ম-সচেতনতা আর কারও ছিল না। কথায় ছিল সহজ স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য, কিন্তু প্রয়োজনমতো খোঁচা তিনি দিতে জানতেন, প্রখর হতে পারতেন, কঠিন হতেও না পারতেন তা নয়। বাইরের পুরুষেরাও তাকে এজন্য ভয় করত, সম্মান করত, কারণ, তিনি অপ্রতিহতপ্রভাবা। এক কথায়, এ ব্যক্তিত্ব রাজ্যশাসন করতে পারত, এবং রাজ্যপালনও করতে পারত। যে ক্ষেত্রে তিনি পড়েছিলেন সেখানেও স্বাভাবিকভাবেই তিনি পরিবারের ছেলে-মেয়ে ও মহিলাদের শাসন করেছেন, এবং প্রাণপণে ছেলে-মেয়েদের পালনও করেছেন। শিক্ষাই কি কম দিয়েছেন আমাদেরকে? সেদিনের বাঙলা রামায়ণ-মহাভারতের পরে বঙ্কিম, রমেশচন্দ্র, দীনবন্ধু হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র প্রভৃতি মা জেঠাইমারা পড়েছিলেন; মাইকেলকে নিয়ে অসুবিধায় পড়তেন। কিন্তু সে সবের রসগ্রহণ সেজ জেঠাইমা যে পুরোপুরি করেছিলেন আজও তাঁর কথার টুকরো থেকে তা বুঝতে পারি। ধর্মগ্রন্থ, বিশেষ করে অমিয়নিমাইচরিত শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের মতো বই আমাদের বাড়িতে সুলভ ছিল। জেঠাইমা তা পড়ে যে-আলোচনা মাঝে-মাঝে আমাদের কাছে করতেন, তাতে আজও বুঝি তাঁর বোধশক্তি ছিল গভীর। আরেকটা কথাও বলতে হবে—এদেশের মানুষও যে আমাদের দর্শনের মূলতত্ত্ব সহজেই অনুধাবন করে ফেলেন—অদ্বৈতবাদ কী, আর বেদান্তবাদই বা কী, গীতার নিষ্কাম কর্ম, বিশ্বরূপী দর্শন যে কী সত্য—এসব তাঁদের উপলব্ধি করতে কিছুই কষ্ট হয় না—সেজ জেঠাইমায়ের টুকরা-টুকরা কথা স্মরণ করলে আজও তা বুঝতে পারি। হয়তো চিরদিন পুরাণ ইতিহাস শুনতে-শুনতে এসব আমাদের জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সংস্কৃতির

কতখানি গভীরতায় ও প্রসারতায় তা সম্ভব হয়। এই সেজ জেঠাইমা আমার কাছে এ সব নানা কারণে মায়ের থেকেও বেশি আপনার ছিলেন। হয়তো কথাটা বাড়াবাড়ি শোনাল। কিন্তু, না। আমি তাঁর কাছে এমনি আপনার ছিলাম। আজ বুঝি, প্রবল ব্যক্তিত্বের মধ্যে যে দৌর্বল্য থাকা অনেক সময়েই সম্ভব, তা তাঁরও মধ্যে ছিল—কেউ-কেউ সে সুযোগও নিয়েছে, আবার কেউ-কেউ তাঁর কাছে বাধাও পেয়েছে। কিন্তু যারা আপনার হতে পেরেছে তারা পেয়েছে কী স্নেহ, কী সবল সহায়তা, বিপুল দাক্ষিণ্য, বুদ্ধি-মার্জিত শিক্ষা, বিদ্যানুরাগের স্বাভাবিক প্রেরণা—আমি তার একজন—পুত্রকন্যাদের সঙ্গে আমাকে তিনি বাল্য থেকে এক করে নিয়েছিলেন। তাঁর কাছেই আমি পরেও অনেক সময় কাটিয়েছি। অনেকেই তাই জানেন—রবীন হালদার, প্রফুল্ল হালদার ও লক্ষ্মীর আমি সহোদর। আমরাও তাতে আপত্তি দেখি না। ওরা তিন সহোদর চার সহোদরা, আমরাও তাই—আরও তিন জেঠতুত বোনও আমাদের আছে, আগেই বলেছি, জন্মগত গণনায় এরূপই হয়। না হলে আর সকল দিকেই আমরা সহোদর।

বাং ১৩৩৯-এর বৈশাখী পূর্ণিমায় জেঠাইমা কলকাতায় নিউমোনিয়ায় মারা যান। তখন আমি আলিপুরে প্রেসিডেন্সি জেলে—জানতেও পারি নি মাত্র দিন পনের পূর্বে তাঁকে শেষ দেখেছি—পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে তাদের গাড়িতে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। তিনি খবর পেয়ে বাড়ি থেকে ছুটে এসেছেন আমাকে দেখতে। তিনি ফুটপাতে, আমি গাড়িতে, কথা হয় নি, দেখা হয় চোখের।

ঠিক ত্রিশ বৎসর পরে গত বৎসর ১৯৬৯-এর বৈশাখী পূর্ণিমায় আমার মা আমাদের ত্যাগ করে যান। বৈশাখী পূর্ণিমার থেকে পুণ্যদিন আমার মতে ভারতবর্ষের ইতিহাসে আর নেই—বুদ্ধদেবের জন্ম, বুদ্ধত্ব লাভ ও মহাভিনিক্রমণের দিন বৈশাখী পূর্ণিমা।] জেঠাইমার তুলনায় মা নিশ্চয়ই ব্যক্তিত্বে সামান্য। আসলে মা কোনোদিকে অসামান্যা ছিলেন না। রূপে না, বিদ্যায় না, বুদ্ধিতে না, কর্মনৈপুণ্যেও না। তিনিও পড়তেন, লিখতেন, কিন্তু বুদ্ধির প্রাখর্য তেমন ছিল না, ব্যক্তিত্ব ছিল না প্রবল, কথা বলতেন। সাধারণ দশজন বাঙালী মায়ের মতোই তিনি দেখতে শুনতে। তবু তাঁকে অসামান্য মনে হত কেন? মা বলে? এ কথাটাও ঠিক। কেন্দ্রী করেছেন

আমার অধ্যাপক-বন্ধুরা একবার বিশেষ একটু নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করেন—মা তখন কদিনের জন্য আমার কাছে এসেছিলেন; বন্ধুরা বললেন, মা-রূপে তাঁকে দেখে তাঁরা বিশেষ ইম্প্রেশড হয়েছেন। প্রতিবেশিনীদের একাধিকের কাছে তিনি সুবাদে মা; অনুগতদের মধ্যে পুত্রসংখ্যাও কিছু ছিল। অর্থাৎ, মায়ের মা-ছাড়া আর কোনো অসাধারণ পরিচয় ছিল না। এরূপ প্রকাশের আরও একটা কারণ ছিল। তখনো মায়ের জীবনে দুঃখ-ক্লেশের ছায়া ঘনিয়ে আসে নি। তিনি জন্মেছিলেন সুসম্পন্ন সংসারে। তাঁর পিতা সেদিনের আবগারী দারোগা—আমি তাঁকে দেখেছি বৃদ্ধ অচল। কিন্তু কর্মজীবনে তিনি দারোগার মতো ধনার্জন করেছিলেন, অথচ তা সঞ্চয় করেছিলেন হিসাবী মানুষের মতো। কার্পণ্যে কিন্তু মোটা হিসাবে তাঁর মারাত্মক ভুলও হয়। তা তাঁর মৃত্যুর পূর্বেই বোঝা গিয়েছিল। প্রথমত তিনি বড় কন্যাকে বড় কুলীনে পাত্রস্থ করে ঘরজামাই আনলেন এক কুলীন পুত্রকে। এ ভুলই যথেষ্ট হত। তারও পরে একমাত্র পুত্রের আকস্মিক বিয়োগে তিনি শোকার্তা স্ত্রীর সান্ত্বনার জন্য গ্রহণ করলেন দত্তক। তৃতীয় ভুলটা আরও করুণ। স্বল্প পরেই প্রথমা স্ত্রীর বিয়োগে তিনি লুকিয়ে গঙ্গাপার থেকে বিয়ে করে আনেন সুরূপা, পশ্চিমবঙ্গীয়া দ্বিতীয়া স্ত্রী। নারীটিও নিতান্ত বালিকা ছিলেন না। গ্রামের প্রতিদ্বন্দ্বীরা বিষয়ী লোককে অপদস্থ করবার জন্য বললেন—তিনি বিধবা। একঘরেও তাঁদের করলেন। কিন্তু তাতে ঠেকানো গেল না। একটি পুত্রও সেই নতুন পত্নীর গর্ভে তাঁর লাভ হল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ছ-সাত বৎসর বয়সে সে পুত্রও মারা যায়। আর, তখন এই পাণ্ডববর্জিত রাজ্যের স্বজনহীন পুরী ছেড়ে সেই স্ত্রী যতটা সম্ভব অলঙ্কার ও পয়সাকড়ি সংগ্রহ করে পিত্রালয়ে চলে যান—আর এদিকে তিনি আসেন নি। কাজেই, শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধ পক্ষাঘাতগ্রস্ত দুর্গাচরণ চক্রবর্তী যখন মারা গেলেন (সে বোধহয় ১৯১৩-১৪ ইং সাল), তখন তাঁর সম্পত্তি নষ্ট করবার মতো লোকের অভাব হল না। অনতিবিলম্বেই তা সমাধা হল। অবশ্য এসব অনেক পরের কথা। আমার মা জন্মেন ও পালিত হন স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে। ঘরে তখন সবে বিমাতা এসেছেন, কিন্তু ধনজন, বিষয়-সম্পত্তি, দোতলা বাড়ি—কিছুরই তাঁদের অভাব ছিল না। সে তুলনায় তাঁর পতিকুল ছিল সৌভাগ্যে খর্বিত। সেখানে ছোট বউ হিসাবে শাশুড়ির নিকট মা বরাবর স্নেহ ও আদর পেয়েছেন, কিন্তু বাড়িতে

ছোট বউদের প্রতিষ্ঠা পাবার কথা নয়। তিনিও পান নি। অবশ্য আত্মমর্যাদাবোধ তখন সকল দিকে দেখা দিয়েছে। গ্রামের বাড়িতে তার প্রকাশের অবকাশ না থাক, শহরের জীবনে কিন্তু সে অবকাশ সৃষ্টি হচ্ছে। তবু নিজের জোরে তাতে প্রতিষ্ঠিত হবার মতো প্রকাশ্য চেষ্টা দেখা দেয় নি। আর মায়ের সেই জোরও ছিল না—তিনি অসামান্যা নন। বাড়ির ছোট বউ হিসাবে তাঁকে চলতে হয়েছে মুখ বুজে, কাজ করতে হয়েছে মাথা গুঁজে, কথা বলতে হয়েছে ভয়ে দ্বিধায়। আমার তো শৈশবের প্রথম স্মৃতি এই—মা আমাকে ফেলে রেখে রান্নাঘরে রাঁধতে গিয়েছেন। কেঁদে আপত্তি করে কোনো ফল পাচ্ছি না—বরং অসাবধানতায় তক্তপোশ থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় ব্যথা পেলাম। তাতেই মা রান্না ছেড়ে ছুটে এসে কোলে নিলেন। এবং বোধহয় আমাকে ঘুম পাড়িয়ে আবার গিয়ে ঢুকলেন রান্নাঘরে। "মা রাঁধে, গোপাল কাঁদে"—এইটাই আমার কাছে কোন্ গৃহচ্ছবির ছন্দোবদ্ধ প্রথম রচনা। তার মধ্য দিয়ে ছন্দের ইন্দ্রজাল অনুভব করি নি, দেখেছি ক্ষোভ, আপত্তি, বেদনায় ব্যাহত শিশুহৃদয়ের স্নেহাকাঙ্ক্ষার প্রকাশ। একটার পর একটা পর্ব পেরিয়ে কিন্তু মাও শেষ পর্যন্ত প্রকাশের অবকাশ পেলেন। তখন বাবা প্রতিষ্ঠাবান, মা প্রৌঢ়ত্বে পদার্পণ করেছেন, আমরাও বড় হয়েছি—পরিবেশই যেন তাঁকে অভিষিক্ত করলে মর্যাদায়। দশজনকে খাওয়াতে পরাতে তখন তাঁর আনন্দ, সকলের প্রতি তিনি দাক্ষিণ্যময়ী। মাত্র দশ-বারো বৎসর তিনি এই মায়ের সৌভাগ্য উপভোগ করেছেন। তারপরে প্রথম বাবা মারা গেলেন। তারপর আমি তাঁদের সকল আশা চূর্ণ করে জেলে চলে গেলাম। অন্য দু-ছেলেকে মা যতই এ দুর্দিনে স্নেহের আঁচলে ঘিরে মানুষ করতে গেলেন ততই তারা দায়িত্ব গ্রহণ না করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠল। আর আমি যখন ফিরে এলাম তখন আমিই কি দায়িত্ব স্বীকার করলাম? দেশোদ্ধারে আমার তখন নেশা লেগেছে। মা অর্থহীন, বিষয়হীন, অনেকাংশে অসহায়। এই পরিবেশেই মা দিনদিন ক্ষয় হয়ে গেলেন। খুইয়ে ফেললেন সেই প্রসন্ন মাতৃরূপ। রোগে, পীড়ায়, শোকে-তাপে একটু-একটু করে তিনি—বিশেষ করে আমাদের—পুত্রদেরই সৃষ্ট নানা ঝঞ্ঝাটে ক্রমশ হয়ে গেলেন বিষণ্ণ, সদা-ব্যাহত এক অসহায় বৃদ্ধা—নিজেকেও পীড়া দিচ্ছেন, পরকেও পীড়াদান করছেন। শান্তি পেলেন যখন চরম শান্তি পাবার কথা তখন। ধরা পড়ল, তিনি ক্যানসার

রোগাক্রান্ত। সে অসহনীয় যাতনার চিন্তাতে যখন আমি বিচলিত ও বিমূঢ়, ভাগ্যবশে সে রোগ ও তার যন্ত্রণা আরোগ্যের পূর্বেই মা হাসপাতালে চেতনা হারালেন। তারপর ধীরে ধীরে শেষ হয়ে গেলেন—সম্ভবত রক্তের চাপে ও হৃদযন্ত্রের বিকলতায়। মা বাঁচলেন, আমরাও।

সরল, সাধারণ বাঙালী মায়ের মধ্যেও যে অসামান্য সত্তা বিকশিত হয়েছিল, ভাগ্যের চক্রান্তে তা নিষ্পিষ্ট হয়ে যেতে দেখলাম—কিন্তু তাই বলে কি তা মিথ্যা? যা বুঝেছি, ওঁদের কালটা সংসারের কাছে মেয়েদের নিঃশেষে দেবার কাল—পাবার কাল নয়। কিন্তু পাবার দাবিটাও সমাজের মধ্যে দেখা দিচ্ছে—'রাঁধার পরে খাওয়া আর খাওয়ার পরে রাঁধা'—এ নিয়মটাকে বিধিলিপি বলে অকুণ্ঠিতে মেনে নিতে পারছেন না। তবু রাঁধা-বাড়াই তাদের অভ্যাসগত থেকে স্বভাবগত। সৌভাগ্যের দিনে বামুন-চাকর থাকলেও ওঁরা অন্তত একবেলা রাঁধবেন। গৃহকর্ম খুঁজে বার করবেন। কিছু না থাকলে বড়ি দেবেন, আচার তৈরি করবেন, উপকরণ জোগাড় করে করবেন পিঠে-পায়েস, নারকেলের নাড়ু; পুডিং পর্যন্তও মায়ের হাতে উতরেছিল। মেজ জেঠাইমার মতো পায়েস কিন্তু কেউ রাঁধতে জানতেন না—মাংসেও তাঁর হাত ছিল। মাও মাছ-মাংস, বিশেষ করে মাছের কালিয়া, ভালো রাঁধতেন। তাঁর বিশেষত্ব ছিল শুকতো, তিতার ডাল, লাউ বা পেঁপের তিতার ঝোলে। আঃ, সেই হারানো রন্ধন-কলা—দি লস্ট আর্টস অব বেঙ্গল। মাঘমণ্ডল, তারাব্রত, পুণ্যিপুকুরের মতো, গোবর-নিকানো মাটির ঘরে ভক্তিতে আঁকা আলপনার মতো, সেই শুকতো, সেই তিতার ঝোল আজ বাঙাল বাড়িতেও 'লুপ্তশিল্পকলা।'

তাস খেলা পূর্ববাঙলার অন্তঃপুরে তখনো ঢোকে নি, কড়ি, দশ-পঁচিশ, বাঘবন্দীই ছিল তাঁদের খেলা। বরং রামায়ণ-মহাভারতের সঙ্গে ঢুকেছিল বঙ্কিমসাহিত্য। অবশ্য দেখতে-দেখতে এসে গিয়েছিল রবীন্দ্রযুগ—বাবার সময়ে 'প্রবাসী'ই ছিল আমাদের বাড়িতে তার প্রধান বাহন। প্রথম মহাযুদ্ধেই বাঙলা সাপ্তাহিক অচল হয়ে পড়ে, এল বাঙলা দৈনিক। ছেলেরা যখন রাজনীতিতে 'পাগলামো' করছে, মায়েদের পক্ষে তার হেরফের না বুঝলেও তার ঠিকানা খোঁজা প্রায় দুর্বার হয়ে পড়ল। কোথায় কী অঘটন ঘটল, তা পড়ে মায়ের ভয়, বাবারও—বুঝি আমি তাতে জড়িয়ে পড়ছি। খবরের কাগজ না পড়লেও নয়, পড়লেই দুশ্চিন্তা। পুলিশ বাড়ির কাছ

দিয়ে গেলে তাঁর আশঙ্কা। পুলিশের কালো গাড়িগুলো বাড়ির সামনেকার বড় সড়ক দিয়ে যখন যাচ্ছে তখন তাঁর বুক কাঁপছে। বলতেন, "আমার যেন চোরের মায়ের অবস্থা। কাঁদতেও পারি না—সইতেও পারি না।" আমার সহকর্মীরা প্রত্যেকে তাঁর সন্দেহভাজন—অথচ স্নেহভাজনও। আমাকে তারাই বিপদে জড়াচ্ছে; কিন্তু বিপদে যে তারাও জড়িত, তাও বুঝতেন। জেলে যখন ছিলাম অনুমতি পেলে যে করে হোক মা জেলে সাক্ষাৎ করতে আসতেন, সকাল থেকে সে আয়োজন—আর ফিরে গিয়ে রাতভর সেই স্মৃতিমন্থন। তবু দেখতে-দেখতে পড়তে-পড়তে কেমন সবই আবার সওয়া হয়ে যাচ্ছিল। স্বাধীনতা এল, নতুন কী নিয়ে এল? খুঁজে পান না। সত্তর পেরিয়েও ভাঙা চশমা সুতোয় বেঁধে যেমন করে হোক দুপুর-ব্যাপী পড়বেন 'স্বাধীনতা'—আর পড়ে বলবেন, "ধর্মঘট, ধর্মঘট, ধর্মঘটের কাগজ।" আশী বৎসরে হাসপাতালে শেষ শয্যায় তাঁর প্রধান অভিযোগ—খবরের কাগজও পড়তে পাচ্ছি না। যখন দেখি কোন্‌খান থেকে ওঁরা জীবন আরম্ভ করে কোন্‌খানে এসে তা শেষ করলেন, তখন বুঝি দেশের ইতিহাস ওদেরও ছেঁকে, নিংড়ে নিঃশেষ করে দিতে ছাড়ে নি—কিন্তু সে সত্য চোখে পড়ে কার? আমাদের ছেলেদের অন্তত নয়—কারণ, আমাদের ভাবনা—আমার জীবন। মায়ের সম্বন্ধে আমার প্রথম স্মৃতি: "মা কাঁদে। গোপাল কাঁদে" আর শেষ উপলব্ধি: "গোপাল কাঁদে। মা কাঁদে"। জীবনের ফাঁদে ছেলেরা পা দেবেই আর মায়েরা কাঁদবে।

(ক্রমশ)

অমিতাভ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের স্থান

বাংলা গদ্যসাহিত্যের অন্যতম পথিকৃৎ হিসাবে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের (১৭৬২-১৮১৯) নাম স্মরণীয়। শুধু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতদের মধ্যে নয়, সমসাময়িক কালের বাংলা দেশে তাঁর মতো বিপুল পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার অধিকারী ছিল সুদুর্লভ। উইলিয়ম্ কেরী (১৭৬১-১৮৩৪) ও রাজা রামমোহনের (১৭৭২-১৮৩৩) যুগে জন্মগ্রহণ করায় উত্তরকালে মৃত্যুঞ্জয়ের যশ ও খ্যাতি অবশ্যই অনেকটা ম্লান হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সমকালীন ব্যক্তিরা তাঁকে কতটা সম্মান করতেন তা সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাংবাদিক জন ক্লার্ক মার্শ্‌ম্যানের প্রশস্তি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। মার্শ্‌ম্যান তাঁর বিখ্যাত বই *The Life And Times of Carey, Marshman and Ward*-এর প্রথম খণ্ডে (পৃঃ ১৮০) মৃত্যুঞ্জয়কে "The Boethius of the country", "a colossus in literature" ইত্যাদি বিশেষণে অভিহিত করে লিখছেন, "He bore a strong resemblance to our great lexicographer [Dr. Johnson] not only by his stupendous acquirements and the soundness of his critical judgment, but also in his rough features and unwieldy figure. His knowledge of the Sanskrit classics was unrivalled and his Bengalee composition has never been surpassed for ease, simplicity and vigour."

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীরামপুর থেকে প্রকাশিত 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভূমিকাতেও মার্শ্‌ম্যান মৃত্যুঞ্জয়কে "one of the most profound scholars of the age" বলে বর্ণনা করেছেন। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতি যে সে-যুগে সুবিস্তৃত ছিল তা তাঁর প্রতিপক্ষীয় রামমোহনের উক্তি থেকেও জানা যায়। নব্য ন্যায় ও স্মৃতির প্রভাবে বাংলা দেশে যখন উপনিষদ ও বেদান্ত দর্শনের চর্চা লুপ্তপ্রায় তখন যে কয়জন মুষ্টিমেয় পণ্ডিত ঐ দুই শাস্ত্রের অনুশীলনের

ধারা বজায় রেখেছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তাঁদের অন্যতম (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'রামমোহন গ্রন্থাবলী', ২য় খণ্ড, পৃঃ ৬৭)।

হিন্দু শাস্ত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের এই গভীর জ্ঞানের জন্যই ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালতের প্রধান বিচারপতি হিন্দু বিধবাদের সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের বিধান নির্ণয়ের জন্য তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করেন। হিন্দু বিধবাদের স্বামীর সহিত সহমরণ অপরিহার্য নয়, ঐচ্ছিক মাত্র, এবং বেদান্তের দৃষ্টিতে সহমরণের চেয়ে ব্রহ্মচর্য পালনই তাঁদের পক্ষে শ্রেয়স্কর—বহু শাস্ত্র মন্থন করে মৃত্যুঞ্জয় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন (*Parliamentary Papers : Commons : 1821, Vol. XVIII, pp. 119-125*)। লক্ষ্যণীয় এই যে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ে প্রথম পুস্তিকা 'সহমরণ বিষয় প্রবর্তক ও নিবর্তকের সম্বাদ' (১৮১৮) তখনো আত্মপ্রকাশ করে নি। অবশ্য হিন্দু সমাজে সতীদাহ-বিরোধী আন্দোলন সৃষ্টি করে রামমোহন সে যুগে যে অসাধারণ মনোবল দেখিয়েছিলেন, শাস্ত্রজ্ঞ মৃত্যুঞ্জয়ের মধ্যে সে-মনোবলের পরিচয় কোনোদিনই মেলে না। সে যুগের নানা জনহিতকর প্রতিষ্ঠান, যথা হিন্দু-কলেজ, কলকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রভৃতির সঙ্গেও মৃত্যুঞ্জয়ের অল্পবিস্তর যোগাযোগ ছিল (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৷৵০)। বিস্ময়কর প্রতিভা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে মৃত্যুঞ্জয়ের অবদান কতটা মূল্যবান সে বিষয়ে কিন্তু এখনো যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ রয়েছে।

দুই

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কেরীর কলেজের অধীনে মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার ঐ বিভাগের প্রধান পণ্ডিত রূপে নিযুক্ত হন। ১৮০২ থেকে ১৮০৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখা তাঁর তিনটি বই প্রকাশিত হয়—'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২), 'হিতোপদেশ' (১৮০৮) ও 'রাজাবলি' (১৮০৮)। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে রামমোহনের ধর্মমত খণ্ডন করার জন্য তিনি 'বেদান্ত চন্দ্রিকা' বা *An Apology For the Present System of Hindoo Worship* রচনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ তত দিনে ছিন্ন হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় তখন কলকাতা সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত। খুব সম্ভব ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের আগেই (ঐ বৎসর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সঙ্গে তাঁর সংযোগ ছিন্ন হয়) ফোর্ট উইলিয়ম

কলেজের ছাত্রদের জন্য 'প্রবোধচন্দ্রিকা' নামে আরো একখানি বই তিনি লিখেছিলেন, কিন্তু সে-বই প্রকাশিত হয় ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর মৃত্যুর ১৪ বৎসর পরে। এই পাঁচটি বইএর মধ্যেই মৃত্যুঞ্জয়ের স্বনামে প্রকাশিত সাহিত্যকর্মের তালিকা সীমাবদ্ধ। এ ছাড়া পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্যভাষা সংগ্রহ' (১৮১৮) নামে একটি অনুবাদ রচনার কাজে ও উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন' (১৮০১) পুস্তিকা সঙ্কলনের ব্যাপারেও বোধ হয় মৃত্যুঞ্জয় কিছুটা সাহায্য করেছিলেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৷৵০-৸০, ও সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', পৃঃ ১০৯)। কিন্তু তাঁর সাহিত্যকীর্তির বিচারে শেষোক্ত দুটি পুস্তিকাকে অবশ্যই গণ্য করা চলে না। স্বনামে প্রকাশিত পাঁচটি বইএর মধ্যে 'রাজাবলি', 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' ও 'প্রবোধচন্দ্রিকা' এই তিনটিই মৃত্যুঞ্জয়ের মৌলিক রচনা। বাকি দুটি, অর্থাৎ 'বত্রিশ সিংহাসন' ও 'হিতোপদেশ' সংস্কৃত বইএর অনুবাদ মাত্র।

বাংলা গদ্যসাহিত্যের আদি যুগের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বিশেষ স্মরণীয় সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। বাংলা হরফে ছাপা, বাঙালীর লেখা প্রথম গদ্যপুস্তক, রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রথম রচনা 'বত্রিশ সিংহাসন'-এর মাত্র এক বৎসর আগে প্রকাশিত হয়। রামমোহনের আগে বাংলা গদ্যসাহিত্যের লেখকদের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয়ই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি বই লেখেন। তাঁর লেখা 'রাজাবলি' বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ভারতবর্ষের প্রথম ধারাবাহিক (কলিযুগের সূচনা থেকে ইংরেজ রাজত্বের পত্তন পর্যন্ত) ইতিহাস, যদিও আধুনিক সংজ্ঞা অনুসারে একে ইতিহাস বলা চলে কিনা সন্দেহ। উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্য (দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত) এবং বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেন প্রভৃতি স্থানীয় রাজারাও এই 'ইতিহাস'-এর কল্যাণে 'দিল্লীশ্বর'-এর মর্যাদা লাভ করেছেন ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১২৩, ১৩৭-৩৮)। একমাত্র 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বাদ দিলে মৃত্যুঞ্জয়ের অধিকাংশ রচনাই কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের পর্যায়ভুক্ত। 'বত্রিশ সিংহাসন' রচনা করে লেখক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে দুশো টাকা পারিশ্রমিক পেয়েছিলেন। 'প্রবোধচন্দ্রিকা' রচনা করেও তিনি যে অনুরূপ পারিশ্রমিক আশা করেছিলেন তা উইলিয়ম কেরীর লেখা একটি চিঠি থেকে জানা যায় ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৷৶০, ৸০-৸৵০)। 'বেদান্তচন্দ্রিকা' বেদান্ত দর্শনে মৃত্যুঞ্জয়ের গভীর জ্ঞানের পরিচায়ক হলেও

তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার নিদর্শন বহন করে না। পথিকৃৎ-এর প্রাপ্য সম্মান দেওয়ার পর সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের স্থান তাহলে কোথায়?

তিন

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ঐতিহাসিকদের কাছে উপহাসের বস্তু বলেই বিবেচিত হত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' বইএ লেখেন, মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষা "সংস্কৃতাশ্রয়ী, কিন্তু নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও নীরস। কোন কোন স্থান দীর্ঘ সমাস সমন্বিত এবং নিতান্ত অপ্রচলিত শব্দ দ্বারা গ্রথিত, আবার কোনো কোনো স্থান একান্ত অপভ্রংশ পদ দ্বারা বিরচিত। কোন কোন স্থলে বাক্যের দীর্ঘতা ও বিশৃঙ্খলতার জন্য অর্থবোধই হইয়া উঠে না।" অবশ্য লেখকের মতে মৃত্যুঞ্জয়ের যুগে এই রকম ভাষা আদৌ অস্বাভাবিক ছিল না ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ২০৬-২০৭)। সে যুগের অপর একজন সাহিত্য-সমালোচক, রাজনারায়ণ বসু তাঁর বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় (১৮৭৮) 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র', 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা' ইত্যাদি প্রাক্-রামমোহন যুগের বাংলা গদ্যরচনা সম্বন্ধে মন্তব্য করেন (পৃঃ ২২): "উল্লিখিত গ্রন্থসকল এমন অপকৃষ্ট বাংলা ভাষায় লিখিত যে, রামমোহন রায়কে বাংলা গদ্যের স্থষ্টিকর্তা বলিলে অন্যায় হয় না।" দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' রামরাম বসুকে সাহিত্যশিল্পী হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের উপরে স্থান দিয়েছেন। তাঁর মতে 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র'-এর মধ্যে রাম বসু অনেক মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করেছেন সত্য কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় প্রমুখ পণ্ডিতের রচনায় সংস্কৃত শব্দের ও সমাসের যে বিকট সমন্বয় দেখা যায় তার তুলনায় রাম বসুর মুসলমানী শব্দের ঘটা অতি অল্প। "সংস্কৃতের পণ্ডিতদের মত তিনি [রামরাম বসু] তাঁহার উপহাসাস্পদ পাণ্ডিত্যের ঝুঁড়ি বাহির করিয়া সাহিত্যের আসরে আসেন নাই।" ('বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', নবম সংস্করণ, সন ১৩৫৬, পৃঃ ৩৭৬) ডক্টর সুশীলকুমার দে তাঁর *History of Bengali Literature in the Nineteenth Century* (Calcutta, 1919) বইটিতে মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সম্বন্ধে এই ধারণাকেই আরো দৃঢ় করেছেন। তাঁর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের শ্রেষ্ঠ রচনা 'প্রবোধচন্দ্রিকা'ও "wholly devoid of all

artistic instincts of proportion or arrangement." (p. 219)। এর মধ্যে যে বিভিন্ন ভাষারীতি স্থান পেয়েছে ডক্টর দের মতে সেগুলি বইটির সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে নি ("sudden and ludicrous descent from the most pedantic and laboured language to the extreme vulgarity of the popular dialect.")।

আধুনিক কালে কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের সাহিত্যকীর্তি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিপরীত একটি মতবাদ কোনো কোনো সাহিত্য-সমালোচকের লেখনীমুখে দেখা দিয়েছে। খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্যের 'বীরবল'-ই প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন ১৩২১ সালে উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতিরূপে। 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'র গদ্য প্রমথ চৌধুরীর মতে মৃত্যুঞ্জয়ের নিজস্ব রচনা নয়। "'দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত পদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।…নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাংলা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল এ কথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেননা, তিনি একদিকে যেমন সাধু ভাষার আদি-লেখক—অপর দিকেও তিনি তেমনি চলতি ভাষারও আদর্শ লেখক।" মৃত্যুঞ্জয়ের চলিত ভাষা, প্রমথ চৌধুরীর মতে, 'সজীব, সতেজ, সরল, স্বচ্ছন্দ ও সরস। ইহার গতি মুক্ত;—ইহার শরীরে লেশমাত্রও জড়তা নাই" ('সবুজ পত্র', ফাল্গুন ১৩২১, পৃঃ ৭৮০-৭৮২)। প্রমথ চৌধুরীর এই মতবাদ পরবর্তী যুগে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বিশেষ দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন করেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার-এর জীবনীতে (কলিকাতা, ১৩৫২ সন) ও তাঁর সম্পাদিত 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র (কলিকাতা, ১৩৪৬ সন) ভূমিকায় খুব স্পষ্ট ভাষায় এই মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে বাংলা গদ্যের নিতান্ত শৈশবকালেই মৃত্যুঞ্জয় বিভিন্ন গদ্যরীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এবং বিভিন্ন বই বিভিন্ন রীতিতে রচনা করে দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন। অবশ্য একথা ঠিক যে সংস্কৃত ভাষায় মহাপণ্ডিত মৃত্যুঞ্জয় স্বভাবতই যতদূর সম্ভব সংস্কৃত রীতিকে প্রাধান্য দিয়েছেন, কিন্তু খাঁটি বাংলা রীতিকেও তিনি উপেক্ষা করেন নি। সাধু ও চলিত এই দুই ভিন্ন রীতির পার্থক্য বাংলা দেশে সর্বপ্রথম তিনিই উপলব্ধি করেছিলেন, "তিনিই বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম

কন্‌শাস আর্টিস্ট" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা : 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৮, ৩৬)। 'মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন যে সাহিত্যিক হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ের খ্যাতিলোপের প্রধান কারণ তাঁর ধর্মমত এবং পরবর্তী যুগে "প্রগতিপন্থী সমাজের সক্ষম প্রচার।" (পৃঃ ı/০, ১/০) মৃত্যুঞ্জয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী রামমোহনই যে লেখকের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য তা বোধ হয় বলার অপেক্ষা রাখে না। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রামমোহন-জীবনীতেও (সাহিত্যসাধক চরিতমালা—১৬ : 'রামমোহন রায়', পৃঃ ৭১) "বাংলা গদ্য সম্পর্কে রামমোহনের কীর্তি সামান্য নয়" এ-কথাটুকু স্বীকার করার আগেই ঘোষণা করেছেন, বাংলা গদ্যের "স্রষ্টা যদি কাহাকেও বলিতে হয়, তাঁহার [মৃত্যুঞ্জয়ের] দাবী সর্বাগ্রে।" সজনীকান্তের মতে 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র ভাষাতে মৌখিক রীতি, সাধু বা সাহিত্যিক রীতি এবং সংস্কৃত রীতি, এই তিন রীতির নিদর্শন থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মৌখিক রীতির প্রতিই মৃত্যুঞ্জয়ের প্রবণতা ছিল। "বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পিরূপে মৃত্যুঞ্জয়কে পূজা নিবেদন করিতেই হইবে।" মৃত্যুঞ্জয়ের সাধু ভাষাই পরে উত্তরোত্তর পুষ্টিলাভ করে শেষপর্যন্ত বিদ্যাসাগরী রীতিতে স্থায়ী হয় (সজনীকান্ত দাস, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'— প্রথম খণ্ড; কলিকাতা, ১৩৫৩ সন; পৃঃ ১৫৭-১৬৫)। ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত-এর পরবর্তী সাহিত্যসমালোচকদের অধিকাংশই এই দুই গবেষকের রায়কে চূড়ান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যে' (কলিকাতা, ১৩৬৩ সন) বলছেন, "মৃত্যুঞ্জয় বাস্তবিক নিপুণ ভাষাশিল্পী ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃতান্বিত বাংলা গদ্য সমাস-সন্ধি-জড়িত ও দীর্ঘ পদবিন্যাসবহুল হইলেও তাহার অন্বয় ও অর্থবোধ আদৌ দুর্বোধ্য নহে।" তারপর সজনীকান্তের প্রতিধ্বনি করে তিনি মন্তব্য করেছেন, "মৃত্যুঞ্জয়ের ভাষার মধ্যেই বিদ্যাসাগরের ভাবী সম্ভাবনার বীজ উপ্ত হইয়াছিল এ কথা অবশ্য স্বীকার্য" (পৃঃ ১০৯-১১০)। মৃত্যুঞ্জয় বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন বা মৌখিক রীতির প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল এ কথা অসিতকুমার কোথাও স্পষ্টভাবে বলেন নি, কিন্তু কেরী সাহেবের 'কথোপকথনে' (১৮০১) "চলিত ভাষার যে বলিষ্ঠ ও অমার্জিত রূপ দেখা যায় মৃত্যুঞ্জয় তাহাকে শিল্পীচেতনার সাহায্যে আস্বাদ্যমান অনুভূতিতে পরিণত করেন" [পৃঃ ১১২), এ-কথা তিনি অসঙ্কোচে ঘোষণা করেছেন।

মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যরচনা সম্বন্ধে আধুনিক সমালোচকদের মতবাদ প্রধানত তাঁর 'প্রবোধচন্দ্রিকা'কে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। 'বত্রিশ সিংহাসনে'র ভাষা অপেক্ষাকৃত সরল হলেও এর মধ্যে কোথাও মৌখিক ভাষার প্রতি লেখকের প্রবণতা দেখা যায় না। সে যুগের কথকতার ভঙ্গীতে বইটি লেখা হয়েছে।··· "শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহাসন পাইয়া বড় ঘটাতে অভিষিক্ত হইয়া সিংহাসনে বসিলেন। যখন সিংহাসনে বসেন তখন ইন্দ্রের ন্যায় শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্য সাহস উদ্যোগ বুদ্ধি পাণ্ডিত্য শ্রীবিক্রমাদিত্যের হয়।···রাজসভাতে প্রত্যহ শত ২ বেদজ্ঞ বেদান্তী, মীমাংসক তার্কিক সাংখ্যবেত্তা পাতঞ্জলবেত্তা বৈশেষিক শিক্ষা কল্প ব্যাকরণ নিরুক্ত জ্যোতিষ স্মৃতি সাহিত্য নাটক নাটিকা অলঙ্কার নীতিশাস্ত্র দণ্ডশাস্ত্র আয়ুর্বেদ প্রভৃতি নানা শাস্ত্রবেত্তা শ্রীকালিদাস বররুচি ভবভূতি ক্ষপণক অমরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর বরাহমিহির ধনন্তরি প্রভৃতি বসেন" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ৭)।

'হিতোপদেশে'র ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী, কোথাও কোথাও সংস্কৃতের আক্ষরিক অনুবাদ; আধুনিক বাংলা গদ্যের সঙ্গে এর যোগসূত্র অতি ক্ষীণ।··· "আপৎকাল উপস্থিত হইলে বৃদ্ধলোকের বাক্য গ্রাহ্য হয় আর অন্যত্রও বিচারক্রমে গ্রাহ্য হয় কিন্তু ভোজন বিষয়ে গ্রাহ্য নয়, যেহেতুক পৃথিবীমণ্ডলে সকল অন্ন ও জলাদি আশঙ্কা কর্তৃক ব্যাপ্ত তাহাতে কোথা প্রবৃত্তি কর্তব্যা কি প্রকারে বা জীবন ধারণ কর্তব্য। সেই প্রকার পণ্ডিতদিগের কর্তৃক কথিত হইয়াছে ঈর্ষাবিশিষ্ট ও ঘৃণাযুক্ত ও অসন্তুষ্ট ও ক্রুদ্ধ ও সর্বদা সশঙ্ক আর পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় জন দুঃখভাগী হয়" (ঐ, পৃঃ ৫৫)। অথবা—"দমনক বলিতেছে তথাপি স্বামীর চেষ্টানিরূপণ সেবকের অবশ্য কর্তব্য করটক বলিতেছে সমস্ত কার্য্যেতে নিযুক্ত যে প্রধান মন্ত্রী সেই করুক যেহেতু ভৃত্যদের পরাধিকার চর্চা কোন প্রকারে কর্তব্য নহে দেখ যে জন প্রভু হিতেচ্ছাতে পরাধিকার চর্চা করে সে বিষণ্ণ হয় যেমন চীৎকারেতে গর্দভ তাড়িত হইয়াছিল। দমনক প্রশ্ন করিতেছে ইহা কি প্রকার করটক কহিতেছে" (ঐ, পৃঃ ৭২)। অথচ 'হিতোপদেশ' 'বত্রিশ সিংহাসনে'র প্রায় ছয় বৎসর পরে লেখা। অন্তত ঐ ছয় বৎসরের মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় যে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিছু করেন নি সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। সজনীকান্তের মতে সমসাময়িক লেখক গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ'-ও

মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার তুলনায় অনেক সুখপাঠ্য ('বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'—প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৩)।

'রাজাবলি'র সর্বত্র এক ভাষারীতি অনুসরণ করা হয় নি। প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় লেখা, কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাস রচনা করতে বসে লেখককে বহু মুসলমানী শব্দের সাহায্য নিতে হয়েছে।… "তদনন্তর নবাব জাফরালী খাঁ নন্দকুমারকে রাজগী খেতাব দিয়া রাজা কুঞ্জবিহারিকে তগীর করিয়া তাঁহাকে রায় রাঁয়া কার্য্যে মোকরর করিলেন কিন্তু মহারাজা দুর্লভরামের অনুরোধে সাহেব লোকেরদের ইচ্ছামতে সুবের নাএব সুবেদারী কার্য্যে কেহ মোকরর হইল না।" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ১৮৮)। রামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র ভাষার সঙ্গে এর তুলনা চলে। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসের সর্বত্রও আবার এ ভাষা ব্যবহৃত হয় নি। আকবরের সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয় লিখেছেন, "আর ইহার শৌর্য্য বীর্য্য গাম্ভীর্য্য ঔদার্য্য গুণজ্ঞতা গুণগ্রাহকতা দোষত্যাগিতা শিষ্টসমাদরকারিতা দুষ্টবিনাশকারিতা বিদ্যামোদিতা দীনদয়ালুতা দুঃখিজনবন্ধুতা ধনিজনরক্ষকতা বক্তৃতা রসিকতা দাতৃতা ধার্মিকতা প্রজামনোরঞ্জকতা সাহসিকতা সদোৎসাহিতা নিত্যোদ্যম-কারিতা মাতাপিতৃভক্ততা পরমেশ্বরানুরাগিতা প্রভৃতি উত্তম গুণের কথা আমি কত লিখিব…শ্রীবিক্রমাদিত্যের পর এই হিন্দুস্থানে এখন পর্য্যন্ত গুণেতে আকবর শাহের সম সম্রাট আর কেহ হয় নাহি" (ঐ, পৃঃ ১৬৪)। কোথাও আবার একই বাক্যের মধ্যে সংস্কৃত ও ফার্সী শব্দের বিচিত্র সমাবেশ দেখা যায়।—"সুলতান জলালুদ্দীন মহম্মদ আকবর বাদশাহ হইলে বয়রম খাঁ খানখানার পরামর্শে লাহোরের নিকট কলানওরে তক্তে বসিয়া ৯৬৩ নয় শত তেষট্টি হিজ্রি সনে জলুস করিলেন ও সকল দিগে আজ্ঞাপত্র পাঠাইলেন খোতবা ও সিক্কা আপন নামে জারি করিলেন হিন্দুস্থান ও দক্ষিণে গুজরাত প্রভৃতি অনেক দেশ অনেক বন্দর আয়ত্ত করিলেন ও অনেক প্রধান লোক স্বত ইহার অনুগত হইল। আর আকবরের এমনি ভাগ্যের প্রাবল্য হইল যে ইহার নামেতেই জয় হইতে লাগিল…" (ঐ, পৃঃ ১৬৩)। ভাষার ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ নৈরাজ্য কি মৃত্যুঞ্জয়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল? সাহিত্যিক উৎকর্ষ বইটির প্রায় কিছুই নেই বলা চলে। ইতিহাস-গোত্রীয় রচনা হলেও এর মধ্যে বহু কাহিনী বা জনশ্রুতি স্থান পেয়েছে—বিশেষত প্রাচীন যুগের ইতিহাস প্রসঙ্গে।

'বেদান্তচন্দ্রিকা'র ভাষা এতই উৎকট সংস্কৃতাশ্রয়ী যে, যে-রামমোহনের

রচনা আধুনিক কালের বাংলা পাঠকদের কাছে প্রায় দুর্বোধ্য, তিনিও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না জানিয়ে পারেন নি ('রামমোহন গ্রন্থাবলী', ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫)—"অতএব বেদান্ত পরম প্রতিপাদ্য যে ত্রিগুণাতীত তুরীয় জীবব্রহ্মৈক্য শুদ্ধচৈতন্য তিনি স্বরূপতঃ জ্ঞেয়মাত্র স্বশক্তিকৃত ঔপাধিক জগৎকারণাদি স্তম্বপর্যন্ত রূপোপাসনাতে পরম্পরাতেই উপাসিত হন সাক্ষাৎ উপাসিত হন না…" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২০৬)। সূচনা থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত বইটি এই ভাষাতেই লেখা। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'ই মৃত্যুঞ্জয়ের দুরূহ পাণ্ডিত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

লেখকের শেষ প্রকাশিত বই 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'-ও মূলত সাধুভাষা বা সংস্কৃতানুগ ভাষায় লেখা, যদিও এর কোনো কোনো অংশে মৌখিক রীতির প্রয়োগ দেখা যায় (বিশেষত তৃতীয় 'স্তবকে')। বাংলা গদ্য রচনা সম্বন্ধে মৃত্যুঞ্জয়ের আদর্শ কি ছিল আমরা সেটা তাঁর নিজের উক্তি থেকেই কিছুটা অনুমান করতে পারি। 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র মুখবন্ধে তিনি লিখেছেন, "এতদ্রূপে বর্তমান সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা উত্তমা…। অন্যান্য দেশীয় ভাষা হইতে গৌড়দেশীয় ভাষা উত্তমা সর্বোত্তমা সংস্কৃত ভাষা বাহুল্যহেতুক" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী' পৃঃ ২২৩)। মৃত্যুঞ্জয়ের নিজের রচনাশৈলী যে প্রায় সর্বত্র সংস্কৃতানুগ হয়েছে তাতে সুতরাং বিস্ময়ের কিছুই নেই। 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র সমাপ্তিতে মৃত্যুঞ্জয় রামমোহনকে লৌকিক ভাষায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করার জন্য তীব্র আক্রমণ করেছেন।…"আর যেমন মণি পথে ঘাটে পড়িয়া থাকে না কিন্তু তৎপরীক্ষকেরা উত্তম সংপুটেতে অতি যত্নে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখেন তেমনি শাস্ত্রসিদ্ধান্ত নিতান্ত লৌকিক ভাষাতে থাকে না কিন্তু সুপক্ক বদরীফলবৎ [illegible]কাতে বদ্ধ হইলেই থাকে।" তারপর অশ্লীল উপমা প্রয়োগ করে তিনি নিজের বক্তব্য আরো বিশদভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,—"আরো যেমন অলঙ্কারবতী সাধ্বী স্ত্রীর হৃদয়ার্থবোদ্ধা সুচতুর পুরুষেরা দিগম্বরী অসতী নারীর দর্শনে পরাঙ্মুখ হন তেমনি সালঙ্কারা শাস্ত্রার্থবতী সাধুভাষার হৃদয়ার্থবোদ্ধা [illegible]কেরা নগ্না উচ্ছৃঙ্খলা লৌকিক ভাষা শ্রবণ মাত্রেতেই পরাঙ্মুখ হন" (ঐ, পৃঃ ২১৩)। তাঁর নিজের রচনাশৈলী সম্বন্ধে আধুনিক সাহিত্য সমালোচকদের রায় শুনলে সংস্কৃতাভিমানী মৃত্যুঞ্জয় খুব খুশি হতেন কি না সন্দেহ! 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র দ্বিতীয় 'স্তবক', প্রথম 'কুসুমে' (ঐ, পৃঃ ২৪৩-২৪৬) তিনি বাংলা বাক্য রচনার নানা রীতি ও তাদের দোষগুণ নিয়ে বিশদ

আলোচনা করেছেন, কিন্তু কোথাও চলিত বা মৌখিক ভাষায় বাক্য রচনার রীতি শিক্ষা দেন নি। তার কারণ, তাঁর যুগে সেটা সত্যই অভাবনীয় ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ ঠিকই বলেছেন যে, "কোকিলকুল-কলালাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছ নির্ঝরাম্ভঃকণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে", এই বাক্যটি মৃত্যুঞ্জয় "মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণী"র উদাহরণ স্বরূপই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু আমাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মৃত্যুঞ্জয় নিজে এই ধরনের বাক্য রচনার নিন্দা করেন নি, বরং তিনি বলেছেন, "এতদ্রূপ বৈষম্য দোষরহিত যে বাক্য সে সাম্যগুণবৎ বাক্য হয়" (ঐ, পৃঃ ২৪৪)। ব্রজেন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের এই মন্তব্যটুকু আর উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করেন নি (ঐ, ভূমিকা, পৃঃ ১/০)।

'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে অবশ্যই মৃত্যুঞ্জয় মৌখিক বা চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু তার কারণ অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' রচনার উদ্দেশ্য জানতে হয়। বইটির মুখবন্ধে মৃত্যুঞ্জয় নিজেই জানিয়েছেন যে "সকল লৌকিক ভাষার মধ্যে উত্তম গৌড়ীয় ভাষাতে অভিনব যুবক সাহেবজাতের শিক্ষার্থে কোন পণ্ডিত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' নামে গ্রন্থ রচিতেছেন" (ঐ, পৃঃ ২২৩)। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যপুস্তক হিসাবেই বইটি লেখা হয়েছিল, যদিও দুঃখের বিষয় মৃত্যুঞ্জয় তাঁর জীবদ্দশায় এটি প্রকাশ করে যেতে পারেন নি। উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক পর্যন্ত 'প্রবোধ চন্দ্রিকা' পাঠ্যপুস্তক হিসাবে বাংলা দেশে বহুল প্রচারিত ছিল, এমন কি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও সে যুগে বইটির বিশেষ সংস্করণ প্রকাশ করে বাংলা গদ্যের আদি যুগের লেখককে সম্মানিত করেছিলেন (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, 'মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার', পৃঃ ৭)। এই ছাত্রপাঠ্য বইটি লেখার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল লিখিত ও কথ্য বাংলার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের নবাগত বিদেশী ছাত্রদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। মার্শ্‌ম্যান সাহেব বইটির ভূমিকায় লিখেছেন :

"The writer anxious to exhibit a variety of style, has in some cases indulged in the use of language current only among the lower orders ; the vulgarity of which, however, he has abundantly redeemed by his vein of original humour."

('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২১৭)। ভাষাশিল্পী মৃত্যুঞ্জয় নিজেই বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে বসেছিলেন এ কথা মার্শম্যান

বলেন নি। লক্ষণীয় বিষয় এই যে 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'য় চলিত ভাষার ব্যবহার করা হয়েছে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে,—স্ত্রীলোক, নিম্ন শ্রেণীর লোক ও মনুষ্যেতর প্রাণীর কথোপকথনে,—এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ভাষা গ্রাম্যতা অথবা অশ্লীলতাদোষে দুষ্ট" ('মৃত্যুঞ্জয় গ্রন্থাবলী', পৃঃ ২৫৯-২৬৩, ২৮৯-৯০ ইত্যাদি)। অন্যত্র মৃত্যুঞ্জয় শুধু সংস্কৃতানুগ সাধুভাষারই প্রয়োগ করেছেন, যদিও সে ভাষা 'বেদান্ত চন্দ্রিকা'র ভাষার মতো দুর্বোধ্য নয়।

উইলিয়ম কেরীর 'কথোপকথন'-ও (১৮০১) ঠিক ঐ আদর্শে লেখা হয়েছিল। মৃত্যুঞ্জয়কে বাংলা সাহিত্যের "প্রথম কন্‌শাস্‌ আর্টিস্ট" বললে কেরীকে ঐ সম্মান তাঁর আগেই দিতে হয়। অবশ্য 'কথোপকথনে'র তুলনায় 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র ভাষা অপেক্ষাকৃত বেশি জড়তামুক্ত। আসলে কেরী এবং মৃত্যুঞ্জয় উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে তাঁদের পাঠকবর্গের (মুখ্যতঃ, বিদেশী ছাত্রদের) পরিচয় করিয়ে দেওয়া, তাঁরা নিজেরা ঐ সব বিভিন্ন ভাষারীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন এ কথা মনে করা কষ্টকল্পনা মাত্র।

মৃত্যুঞ্জয় যদি সত্যই সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা করতে আগ্রহী হতেন তাহলে তাঁর লেখনী থেকে আদ্যোপান্ত মৌখিক ভাষায় লেখা অন্তত একটি পুস্তিকাও আমরা পেতাম। তার পরিবর্তে আমরা পেয়েছি একই বই-এর, এবং কোথাও কোথাও একই অনুচ্ছেদের, ভিতর সাধু ও চলিত ভাষার এক বিচিত্র বিসদৃশ সংমিশ্রণ, যাকে মৃত্যুঞ্জয়ের শিল্পী প্রতিভার পরিচয় বলে মনে করা সত্যই কঠিন। মৃত্যুঞ্জয়ের রচনা সর্বত্রই দুর্বোধ্য বা অপাঠ্য এ অভিযোগ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন। 'বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ' ও 'প্রবোধ চন্দ্রিকা'র কোনো কোনো অংশে সাহিত্যের আস্বাদও পাওয়া যায়। কিন্তু তিনি সচেতনভাবে বাংলা গদ্যের বিভিন্ন রীতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, অথবা মৌখিক ভাষার প্রতিই তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি ছিল, এ কথা ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের রায় সত্ত্বেও গ্রহণযোগ্য নয়। মৃত্যুঞ্জয়ের যুগেও সাধারণ লোকের চিঠিপত্রাদি অবশ্যই মৌখিক বা চলিত ভাষায় লেখা হত কিন্তু মৃত্যুঞ্জয়ের মতো শাস্ত্রজ্ঞ, সংস্কৃতাভিমানী পণ্ডিত সেই ভাষাকে বিশেষ সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবেন, এটা অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়।

আরো একটি কথা আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন। নিছক সন-তারিখের বিচারে মৃত্যুঞ্জয় অবশ্যই রামমোহনের পূর্বসূরী, কিন্তু রামমোহনের রচনায় প্রকাশভঙ্গীর যে-দৃঢ়তা ও স্পষ্টতা আমরা লক্ষ্য করি, মৃত্যুঞ্জয়ের রচনার কোথাও তা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া রামমোহনের সাহিত্যকীর্তি মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় অনেক বিরাট ও অনেক গভীর মননশীলতার পরিচায়ক। "বাংলা গদ্যের প্রথম স্বাধীন ও শক্তিশালী লেখক" যে রামমোহন রায় (সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস,' পৃঃ ৯৯৭) সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ খুবই কম, যদিও আধুনিক বাংলা গদ্য থেকে রামমোহনের গদ্যের ব্যবধান দুস্তর।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

গোলাপ হয়ে উঠবে

(পূর্বানুবৃত্তি)

পরের দিন দুপুর। একটা স্কুল বাড়ির সামনে মানবদের অস্থায়ী রিলিফ অফিস বসেছে।

রোদ উঠেছে। মেঘ কেটে গেছে। শরৎ-নীল আকাশ। শহিদপুর কলোনিতে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ধার কাজ চলছে। সুখদেও কলার ভেলা বানিয়েছে। ডিঙ্গি যোগাড় হয়েছে দুটো। স্কুলবাড়িটা খোলানো হয়েছে। বিকেল নাগাদ আরো ভলান্টিয়ার এসে পড়বে। দুটো বাঁশের খুঁটিতে সালু ফেস্টুন! পিপলস্ রিলিফ কমিটি। ফকিরচাঁদ সাধু এ অঞ্চলের পি. আর. দির ডাক্তার। কথাবার্তা একটু ব্যাঙ্গাত্মক। মোটা। বেঁটে। কালো। মাথায় অপ্রতিহত টাক। গলায় লাল টকটকে টাই। মানব পরম তৃপ্তিতে পানের পিচ ফেলে, পানের বোঁটা থেকে চুণ চেটে নিতে নিতে ফকিরচাঁদবাবুর সঙ্গে কথা বলছিল। সুব্রত কতকগুলো নাম নিয়ে তালিকা তৈরী করছিল। সাহায্য প্রার্থীদের নামের তালিকা।

—আর সব শকুনী গৃধিনীরা কোথায় হে, কংগ্রেস হিন্দুসভা, সোশালিস্ট—ভাগাড়ে মড়া পড়েছে তোমরা একাই খাচ্ছ। ফকিরচাঁদবাবু সিগারেটটা ধরিয়ে কাটিটা নিবোলেন।

—কংগ্রেসের তাহের সাহেব অফিস খুলেছে, তবে পাত্তা করতে পারবে না। প্রথমত মুসলমান, আর এটা রিফ্যুজি কলোনি। দ্বিতীয়ত—মানব থেমে গেল।

—দ্বিতীয়তটা পরে শুনবো, তুমি প্রথমটার সুবিধে নিয়েছ কিনা বলো।

—আমার সুবিধা নেবার কিছু নেই, ওটা আপসেই যা হবার হয়ে গেছে।

—তুমি তার ফল ভোগ করছ, না করছ না? মৃদু মৃদু হাসছেন ফকিরচাঁদ বাবু।

—এই ফকিরদা চুপ করুন। সুব্রত থামিয়ে দিল—নানা রকম লোক যাতায়াত করছে।

ফকিরচাঁদবাবু একটা সিগারেট ধরালেন—ব্রজদুলালরা আসেনি?

মানব বলল—ঐ তো অশথ গাছ তলায়। অফিস খুলেছে।

—ওরা এখন কাদের সঙ্গে, জয়প্রকাশ নারায়ণ না শ্যামাপ্রসাদ মুখুজ্জে?

—দুইই এক নিঃশ্বাসে চলে ওদের।

—বিচিত্র জিনিস এই ব্রজদুলালেরা, কখনো প্যাটেল, গোবিন্দবল্লভ, কখনো জয়প্রকাশ লোহিয়া, কখনো শ্যামাপ্রসাদ, সাবাড় কর—

—কিন্তু ভুলেও নেহরু নয়। সুব্রত ধরিয়ে দিল।

—খানিক আগে তাহেরের সঙ্গে ব্রজদুলালের তো একহাত হয়ে গেল। এ কথা বলে মানব হাসল।

সাদা এবং কড়া ইস্তিরি করা ট্রাউজারের ধার ঠিক করে গুটিয়ে ফকিরচাঁদ বাবু চেয়ারে বেশ আয়েস করে বসে বললেন—সুব্রত, বুর্জোয়া শ্রেণীর অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখে মানবের হাসিটা দেখ। সুব্রত চুপ করে রইল। স্কুলবাড়িতে যাদের তোলা হয়েছে তাদের অনেকেরই হাঁড়ি চড়েনি আজ। রিলিফ দরকার। চাল, ডাল, কাপড়, রোগে পড়ে আছে জনা কতক, পথ্য, টাকা দরকার। মানবও ভাবিত। ফকিরচাঁদবাবু বললেন—লাগিয়ে দাও তোমাদের দলবল। সুব্রত বলল—ছেলে মেয়েগুলোকে খবর দাও মানব। ফকিরচাঁদবাবু বললেন—হাঁ সেজেগুজে নেমে পড়ুক সব, লোকাল আই. পি. টি. এ.-কে খবর দাও, ঘুঁষি উঁচিয়ে গান হবে না?···হন্তদন্ত হয়ে একজন ভলান্টিয়ার এগিয়ে এল—একটা মেয়ে হঠাৎ বমি করছে। সুব্রত ফকিরচাঁদ বাবুকে বলল—নিন্ এবার ফোড়ন থামিয়ে যা কাজ তাই করুন। কলেরা লাগবে নাকি?

নিরাসক্ত চিত্তে, বিন্দুমাত্র ব্যতিব্যস্ত না হয়ে ফকিরবাবু সিগারেটে শেষটান দিয়ে বললেন—লাগুক, লাগুক, কলেরা ভূমিকম্প, প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, আমি তো আফশোষ করি সুব্রত আগ্নেয়গিরি নেই কেন একটা ইণ্ডিয়ায়, বাড়তি জনসংখ্যাটা তাহলে আর মাথা ব্যথার ব্যাপার হত না।

মোটা শরীরটা নিয়ে অতিকষ্টে উঠলেন ফকিরবাবু।—চল হে, দেখা যাক কেমন বমি। একটা হলঘরের কোণে কাঁথায় শুয়ে রয়েছে একটা বছর পনেরো-ষোলোর মেয়ে। রোগা টিং টিং করছে। চুলে জট। হাতে একজিমা। ইকপরা মেয়েটার বুকের পাঁজরাগুলো হাপরের মতো উঠছে নামছে। মুখটা

লাল। নাকের দুই পাশ ফুলছে। হলঘরে জল, কাদা, ভাঙা সরা বা মালসার টুকরো, বিড়ি আর পোড়া দেশলাইয়ের কাঠি। হাঁড়ি কলসি মাদুর কাঁথা লণ্ঠনের ছড়াছড়ি। কচি ছেলের কান্না। অসুস্থ মেয়েটির কাছে কেউ নেই। বমির ওপর মাছি ভন ভন করছে।

এর বাবা কোথায়? ফকিরবাবুর গলার আওয়াজ চড়ালেন। মেয়েটির কপালে হাত দিতে মেয়েটি আঃ বলে চোখ খুলল। বড় বড় চোখ একটু লালচে। ফকিরবাবু বললেন—কলেরা নয়।

—খুকী তোমার নাম কী?

—মমতা।

—বাবা কোথায়?

—বাবা বাড়ি ফেরেনি কাল।

—মা?

—মা নেই।

ততক্ষণে দু-চারজন এসে দাঁড়িয়েছে। ফকিরবাবু বললেন—এর বাবাটা তো আচ্ছা উজবুক। মা-মরা মেয়েটাকে ফেলে কোথায় গেছে।

—মা ওর মরেনি আজ্ঞে। একজন বলল।

—তিনি আবার কোন চুলোয়।

—চুলোই বটে, ওর—

মেয়েটি আর্তনাদ করে উঠল। আবার বমি করল।

—কাল কী খেয়েছ খুকি?

—কিস্যু না।

—কাল সারাদিন কিছু খাওনি? ফকিরচাঁদ ডাক্তার চোখ কপালে তুললেন! একটা ইনজেকশন দিলেন। একটা প্রেসক্রপসন লিখে দিলেন। সুব্রত প্রেসক্রপসন পড়ে হেসে ফেলল। এসব কী লিখেছেন—দুধ, ডিম, হর্লিক্স্, ফলের রস—

—কী লিখব, শুকনো মিয়নো মুড়ি, বাসিভাত? লঙ্কার ঝাল? ম্যাল-নিউট্রিশন—না খেয়ে খেয়ে মরতে বসেছে, বুঝলে?

—ফাণ্ড্ কোথায়?

—কমিউনিস্ট পার্টির ফাণ্ড দেখে আমি প্রেসক্রপশন লিখব না কি হে!

মেয়েটি বিরক্ত মুখে এদের দিকে তাকিয়ে আছে। অন্যেরা চুপ করে

১৩৭০]

[illegible]। 'আপাতত: মেয়েটিকে একটু ফলের রস খাওয়ানো দরকার'। ঘোষণা করলেন ফকিরচাঁদ বাবু।

—কোথায় পাবো, বিকেলের আগে ফাণ্ড কোথায়?

—তাহলে বিকেল অবধি ও যুঝুক। তোমাদের একটা ছেলেকে ডাকো [illegible]। সুব্রত একটি ভলান্টিয়ারকে ডেকে দিল। খস্‌খস্ করে একটা চিরকুট লিখলেন ফকিরবাবু।—আমার বাড়ি গিয়ে, আমার স্ত্রীকে দেবে। [illegible] যদি তার দিবা নিদ্রা শেষ হয়ে থাকে একবার যেন আসেন এদিকে, [illegible] কাজ করতে হবে। মৃদুস্বরে বললেন—আর ফ্যাটও কমবে।

মেয়েটিকে ততক্ষণে ঐভাবে থাকতে দিয়ে ওরা বেরিয়ে আসছিল। মেয়েটি বলল—শুনুন। ফকিরবাবু ফিরে দাঁড়ালেন। কী বিবর্ণ ক্লান্তি মেয়েটার ফর্সা সাদা মুখখানায়। কুণ্ঠিত ভাবে বলল—

—আমার বাবা টের পাবেন কী করে যে আমি এখানে।

—আমি টের পাইয়ে ছাড়বো এখন, ভেবো না।

বাইরে মানব খবর পেয়েছে বিকেলে ভবেশবাবু আসবেন। সার্কল অফিসারও আসবেন রিলিফের জন্যে। মানব এসব ব্যাপারে সুব্রতর পরামর্শ নিল না। তবে সুব্রতও এটা বুঝল যে মানব তার আগেই রিলিফের সমস্ত ব্যবস্থা শেষ করে ফেলতে চায়। সে দুটো ক্লাবে খবর দিল। একটা সংস্কৃতি-সঙ্ঘ, একটা ব্যায়াম সমিতি—যত বেশি সম্ভব ভলান্টিয়ার চাই।

ওদিকে এদের ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে ব্রজদুলালদের ভলান্টিয়ারদের একটা ছোটখাট ধাক্কাধাক্কি হয়ে গেল। কে বুঝি কাকে রাশিয়ার দালাল বলেছে। মানব এগিয়ে গেল। ব্রজদুলাল একটা মাইক্রোফোন এনেছে। বক্তৃতা শুরু করল। চীন রাশিয়ায় যাদের টিকি বাঁধা তাদের সম্বন্ধে জনতাকে হুঁশিয়ার করতে লাগল। চারটে টিনের চোঙা বের করে মানবেরা তার চতুর্মুখ জবাব দিতে লাগল।—ওরা বলল সুভাষ বোসকে দালাল বলেছে কারা। ওরা বলল—'কারা সুভাষ বোসের লেফট কনসোলিডেশন সম্ভব হতে দেয়নি'। সুব্রতর মনে হল আসলে এটা একটা নির্বাচনী সভা। স্লোগান, পাল্টা স্লোগান। গালাগাল। এবং এ ব্যাপারে খানিকক্ষণের মধ্যেই দারোগা পুলিশ পৌঁছে গেল।

সবাইয়ের গলা ছাপিয়ে ফকিরবাবুর গলা শোনা গেল—লুক হিয়ার দারোগাসায়েব, এখানে, এ্যাট লিস্ট্ গোটা তিনেক পেশেন্ট আছে যাদের নার্ভ

প্রায় স্যাটার্ড। ইউ মাস্ট স্টপ দিস মাইক্রোফোন-সাউটিং। দারোগাবাবু একটি কনস্টেবলকে থানায় পাঠালেন। এস. ডি. পি.-ওর সঙ্গে কথা না বলে তিনি কিছু করতে পারবেন না। ব্রজদুলাল উত্তেজনায় হাত পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে ফকিরবাবুকে উদ্দেশ করে বলল—আপনি তো ওদের ডাক্তার, ওদের কথাই বলছেন। সবাইকে থামান।

টাক টকটকে বেগুনি হয়ে উঠল ফকিরচাঁদবাবুর—ওদের ডাক্তার মানে, রাশিয়ার দালালদের ডাক্তার, ইয়েস তাই, তোমাদের ডাক্তার থাকে তাকে, দেখি রাশিয়ার দালালদের ডাক্তারদের প্যাথোলজি আর আমেরিকার দালালদের ডাক্তারের প্যাথোলজি—বিপন্ন দারোগাবাবু হাত তুলে থামতে মিনতি করলেন। ওদিকে হৈ হৈ করে উঠল ব্রজদুলালেরা, আমাদের আমেরিকার দালাল বলেছে। একটা মারামারির পূর্বাবস্থা। টেনশন চরমে। অগ্রণী ব্যায়াম সমিতি আসতে পারেনি। তার বদলে কোঁচা দুলিয়ে এসে হাজির রবীন্দ্র-সংস্কৃতি বিভাগের ললিতমাধব। মানবের পিত্তি জ্বলে গেছে দেখে।

ঠিক এই সময়ে একটা জিপ সর্বাঙ্গে কাদা মেখে এসে দাঁড়াল। জিপ থেকে নামলেন ভবেশবাবু, লোকাল কংগ্রেসী এম. এল. এ. সার্কেল অফিসার; আর, সুব্রত অবাক হয়ে গেল দেখে—দেবু মুস্তাফি। জিপেই বসে থাকল সে প্রথমটা। দারোগাবাবু ওকে কী রিপোর্ট করতে লাগলেন।

ততক্ষণে এদিকে একটা টানা-হেঁচড়া চলছে। একটি আশ্রয়প্রার্থী পরিবারকে নিয়ে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক ও কমিউনিস্ট স্বেচ্ছাসেবকদের বচসা শুরু হয়েছে। এরা বলছে আমাদের ক্যাম্পে চলুন, ওরা বলছে, আমাদের ক্যাম্পে। বিবাদ মীমাংসা করাও মুশ্‌কিল, কেননা একটা ডিঙি খালি পড়েছিল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকরা সেটা কমিউনিস্টদের ডিঙি হওয়া সত্ত্বেও তাতে করে একটি পরিবার সরিয়ে এনেছে। বন্দেমাতরম, লালঝাণ্ডা কি জয়। দেবু জিপ থেকে স্মার্ট ভঙ্গিতে লাফিয়ে নামল, তারপর গট গট করে একটা সরলরেখা ধরে, কোনো দিকে না তাকিয়ে মানবের দিকে সটান এগিয়ে এল—স্টপ ইট, হোয়াই ডু ইউ সাউট ইন দি ওপেন রোড লাল ঝাণ্ডা কি জয়?

ভবেশবাবুকে সামনে নিয়ে তাহের বক্তৃতা করছে। ইনি অগ্রবর্তী দেশকর্মী। আইনসভার প্রতিনিধি, ইনি···মানবদের ভলান্টিয়াররা প্রশ্নবান

শুরু করল—ছিলেন কোথায় এতক্ষণ? কাল রাত্তির থেকে আজ বেলা চারটে পর্যন্ত লোকগুলোর যে পেটে একটা দানা নেই? দেশের জন্য মলমূত্র ছাড়া কী ত্যাগটা করেছেন?

ফকিরবাবুর টাকে বিকেলের আলো চক চক করছে। তিনি দেবুকে কী বোঝাচ্ছেন। সুব্রত সার্কেল অফিসারকে অবিলম্বে কী রিলিফ দরকার তার তালিকা শোনাতে লাগল। ইতিমধ্যে দেবু সুব্রতকে দেখল। এগিয়ে এল—হাউ ডু ইউ ডু ওলড বয়? কবে ছাড়ল তোমাকে? সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—তুমি এখানে নাকি এখন?

—ইয়েস। মাসখানেক হল এসেছি, এমন গোলমেলে ঝঞ্ঝেটে জায়গা সারা ওয়েস্ট বেঙ্গলে নেই। যত স্মাগলার, ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার। রেপ মার্ডার এভরিডে রুটিন।

—এদিকে এসেছিলে কোথায়?

—ম্যাকরয়েডে লেবার ট্রাবল। লেবার-অফিসারের গায়ে আলকাতরা ঢেলে দিয়েছে। ম্যাকরয়েড লক আউটের দিকে ঝুঁকছে। নাউ ইউ সি গভর্মেন্ট ডাজ নট এনকারেজ লক আউট। কিন্তু ব্রিটিশ কনসার্ন, শুনতে হয় না। এসেছিলাম। আমারি গাড়ি। সার্কেল অফিসারকে তুলে নিলাম। ওঁর সঙ্গে ভবেশবাবু ছিলেন। একের নম্বর বুদ্ধু হে লোকটা। মানব বলে তোমাদের কে আছে এখানে, ভয়ানক রাগ তার ওপর।

ফকিরবাবু গুঁড়ো দুধের প্যাকেটগুলো গুণে নিচ্ছেন। ভবেশবাবু তাহের এবং তার দলবলকে কোথা থেকে চাল আনতে হবে তার নির্দেশ দিচ্ছেন। সার্কেল অফিসার বললেন—রিলিফে দলাদলি করবেন না। ইন দ্যাট কেস আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা করব। আর, দেবুকে ডেকে আলাদা করে কী একটা বললেন।

দেবু, ব্রজদুলাল, তাহের আর মানবকে ডেকে বলল—আই ফাইণ্ড দিয়ার মাচ টেনসন। সাউটিং বন্ধ করতে হবে। চোঙা, মাইক্রোফোন চলবে না। ডোণ্ট কমপেল মি টু টেক লিগ্যাল স্টেপ। হান্‌ড্রেড ফরটি ফোর প্রমালগেট করতে বেশি দেরি লাগে না। বলেই সে আবার এগিয়ে গেল সার্কেল অফিসারের দিকে। তাঁর সঙ্গে নিচু স্বরে কিছুক্ষণ কথা বলে চেঁচিয়ে ডাকল—বড়বাবো, দুটো সিপয় এখানে পোস্ট করে দিন। বশম্বদের মতো বড়বাবু বললেন, ইয়েস স্যার। জিপ হঠাৎ গর্জন করে উঠল। হর্ন কর্কশ ধমক

দিল যেন। সামনের জামরুল গাছে একটা নাম জানা নেই পাখি অনেকক্ষণ ডাকছিল। থেমে গেল। বিকেল ধূসর হতে চলেছে। অনেক পরিশ্রম শেষ করে দেবু মুস্তাফি সার্কেল অফিসার চলে গেলেন। দেবু যাবার সময় সুব্রতকে বলে গেল—যাবে একদিন, অনেকদিন আগেই তোমার যাওয়া উচিত ছিল, ওভার ডিউ হয়ে গেল। সুব্রত বলল—যাবো। কাদা ছিটিয়ে জিপ চলে গেল খৈনি টিপতে লাগল সিপাই দুটো।

ফকিরচাঁদ বাবু ব্যাগ ইঞ্জেকসনের সিরিঞ্জ গুছিয়ে নিলেন। ডিসপেনসারি খুলতে হবে তাঁকে। যাবার আগে সুব্রতকে বললেন—আমার গিন্নি যদি আসেন, যদি নয়, আসবেনই, ঐ মেয়েটির কাছে নিয়ে যেও। সুব্রত বলল—চেনে তো সবাই বৌদিকে? আমি তো দেখি নি কখনো।

—চেনে। আর না চিনলেও দেখলেই চিনতে পারবে। ফিজিক্যালি এবং স্পিরিচুয়ালি কাউকে যদি দেখ আমার চেয়ে ইনফিরিয়র, অথচ মনে হয় সুপিরিয়র বুঝবে সে হল মিসেস সাধু। বিশাল দেহ নিয়ে ফকিরচাঁদ বাবু আড়মোড়া ভাঙলেন।

সুব্রত হাসল। ফকিরচাঁদবাবুও তখনকার মতো বিদায় নিলেন। কলেজের ছেলেমেয়েরা এসেছে। মানব তাদের কাজ বুঝিয়ে দিচ্ছে। সুব্রত উৎসুক চোখে কাকে যেন খুঁজল, পেল না।

ভ্যাপসা গরম। ঘাম হচ্ছে অনর্গল। কোথা থেকে পচা গোবরের গন্ধ আসছে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে—দারুণ মশা। স্কুল বাড়িটায় সামান্য কয়েকটি লণ্ঠন জ্বলছে। চব্বিশ ঘণ্টার ওপর সুব্রত বাড়ি যায় নি। এখন এদিকে আলাদা করে বিশেষ কাজ নেই। স্বেচ্ছাসেবকদের উত্তেজনা কমে এসেছে। যারা পাত্তা পায়নি তারা বাড়ি গেছে। জল এখনো কমে যাবার কোনো লক্ষণ নেই। অনেকে লণ্ঠন জ্বেলে মাছ ধরছে। তার কলরব শোনা যাচ্ছে। বিল ভেসে যাওয়ায় মাছও ভেসে এসেছে। এবং বাজারে মাছের দর হঠাৎ খুব পড়ে গেছে। মশা তাড়াতে তাড়াতে সুব্রত ক্লান্ত হয়ে পড়ল। মানব পার্টি সদস্যদের নিয়ে একটা গ্রুপ মিটিং করে এল। সুব্রতকে স্বভাবতই ডাকা হয় নি। একটা রিলিফ-কমিটি তৈরি করেছে মানব। ফকিরচাঁদবাবু সভাপতি এবং সে নিজে সম্পাদক। সুব্রতর নাম সে কমিটিতে নেই। যেন মানব বুদ্ধি করে কমিটির নামগুলো একবার সুব্রতকে শুনিয়ে গেল। যেন ওকে দিয়েই অনুমোদন করিয়ে নিল। কাঠের ধোঁয়ায় সুব্রতর চোখ জ্বালা

করছিল। আশ্রয়প্রার্থীরা কেউ কেউ রান্না চড়িয়েছে। মমতা বলে সেই মেয়েটিকে একটি আলাদা ছোটঘরে রাখা হয়েছে। ফকিরবাবুর স্ত্রী মীনাক্ষী দেবী এসেছিলেন। সুব্রত অবাক হয়ে গেছে ভদ্রমহিলার রূপ দেখে। ভাবল, ফকিরবাবুকে এ নিয়ে পরে ঠাট্টা করবে এখন। মমতাকে ফলের রস খাওয়ানো হয়েছে। মেয়েটা ঘুমোচ্ছে অঘোরে। গুঁড়ো দুধের রিলিফ বিলি করা হয়েছে একবার।

অন্ধকারে সব মিশে গেছে যেন। দূরে গুণ গুণ কথা বলার আওয়াজ ভেসে আসছে। বিড়ি ধরানোর দেশলাইয়ের আগুন দেখা যাচ্ছে। কাল থেকে আজ পর্যন্ত রুচিকে মিলিয়ে সে যেন একটা অভিভূত অবস্থার মধ্যে ছিল। বন্যার জল, সারারাতের ক্লান্তি, সারাদিনের উত্তেজনা সব কিছুতেই সে সহজে ডুব দিতে পেরেছে। এতক্ষণে সেই পুরনো ক্লান্তিটা কি আবার ফিরে এল—সব যেন ছোট, সব যেন মুখোস, ঠিক এই সময়টাতেই তার বারে বারে মনে হয়—তার কোথাও যাবার নেই। কেন মানব এমন করে—রিলিফ কমিটির সম্পাদক সুব্রত চৌধুরী হলে কার ক্ষতি হত? কেন অবিশ্বাস! ক্লান্ত—যেন এখানেই ঘুমিয়ে পড়বে সে। কলেজের ছেলেমেয়েরা ভলান্টিয়ার হয়ে এসেছে—কই রুচি তুমি তো এলে না। মানবকে কে যেন বলেছে রুচির বাবা আসতে দেন নি। ঘুম-ঘুম আসছে। হাই উঠল। অনিবার্য হাই। কী বলেছে মানব মিটিঙে-সমস্ত ব্যাপারটা পার্টি ইনিসিয়েটিবে থাকা চাই। এবং কমরেডগণ পার্টির ইনিসিয়েটিব তাদেরই হাতে থাকবে এ্যাকশনের মাঠে যারা যাচাই হয়েছে। কমরেডগণ ভ্যাসিলেটিং এলিমেণ্টস দিয়ে কিছু হয় না। —'মানবদা, শুনছেন স্কুল বাড়ির ওপরের ঘরে কে যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে'। 'ওটা কোন ঘর?' 'মমতার ঘর'? ওকে তো ওখানেই রাখা হয়েছে। হঠাৎ একটা কলরব উঠল। সুব্রত চকিতে উঠে দাঁড়াল। কে যেন কাকে মেরেছে—তাকে সকলে আক্রমণ করতে চাইছে। বন্ধ দরজায় কারা ধাক্কা দিচ্ছে। সুব্রত উঠে গেল ওপরে। মমতারই ঘর। ভেতর থেকে মমতার কান্না ভেসে আসছে।—কী ব্যাপার? অনেক লোক দরজার কাছে, জানলায় বারান্দায়। 'মেরেই ফেলব শালাকে আজ'। ম্লান লণ্ঠনের আলোয় সকলের মুখ ক্রোধে বীভৎস। মানবেরা হুইসিল বাজালো। ভল্যান্টিয়ারেরা ছুটে এল। সুব্রতও দরজার কাছে এগিয়ে গেল—কঠিন হাতে দরজায় আঘাত করল। হঠাৎ দুম করে দরজাটা খুলে গেল। দরজা আগলে দুদিকের

চৌকাঠ ধরে দাঁড়াল মমতা।—কী চান? সুব্রত যেন হতভম্ব হয়ে গেল। ময়লা ফ্রকপরা, এলোমেলো চুল, লাল চোখ, গালে চোখের জলের দাগ। মেয়েটা যেন সাপের মতো ফোঁস করে উঠল। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—কী হয়েছে তোমার? ঘরে কে?—আমার বাবা। বাবা এখন ঘুমোবে আপনারা যান। দুর্বল মেয়েটা ঠক ঠক করে কাঁপছে। যেন পড়ে যাবে। কে একজন গর্জন করে উঠল—এই মেয়েটাই ওর বাবাটাকে শায়েস্তা করতে দেয় না। মশাই রে, ফি রোজ মদ খেয়ে এসে মেয়েটাকে চোরের মার মারে। আর মেয়েটা সেই মার গরুর মতোন সহ্য করে। আমরা কতবার বলেছি এর একটা বিহিত করা দরকার—ছুঁড়িটা মশাই বাগড়া দেয়। মেয়েটা কোনোদিন খায় কোনোদিন খায় না। হারামজাদা বাবা নেশা করে ঘুরে বেড়ায়, খোঁজও রাখে না। বাড়ি ফিরে একবার তালাসও করে না, হ্যাঁরে কী খেলি—আর সেই বাবার জন্যে—

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে মমতা ঘরের মধ্যে মিলিয়ে যায়। সেই লোকটিই বলল, দেখুন গিয়ে বাবার মাথা কোলে করে মাথায় হাত বুলিয়ে বাবাকে ঘুম পাড়াচ্ছে এখন—

আর একজন বলল, আদিখ্যেতা। আর একজন সন্দেহ করল—বাবাটা মানুষ না জানোয়ার। অন্য একজন বলল—মেয়েটাই বা কী মানুষ না ভেড়া?

অন্ধকার কাঁচা রাস্তা ধরে সুব্রত বাড়ি ফিরল। মানব ও ফিরছে। ওখানে রাত্রের কাজ বেশি নেই। মানব তার স্বভাব মতো নানা কথা বলছিল। ঘুরে ফিরে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অবস্থার আলোচনা শেষ করে মানব ভারতবর্ষের কথায় এল। পার্লামেন্টারি ডেমোক্রেসির মধ্যে ডুব দিলে পার্টির বিপ্লবী চরিত্র কতটা থাকবে বলে সুব্রত মনে করে—সে কথা মানব জিজ্ঞাসা করল। ক্লাস স্ট্রাগল আর পার্লামেন্টারি রাজনীতি তেঁতুলের আমসত্ত্ব হয়ে যাবে না?

সুব্রত বলল—ভাবছি।

মানব বলল—আপনি মেম্বারশিপ রেসটোর করবেন?

—ঠিক করিনি এখনো।

—একটা কথা বলবো, একটু ডেলিকেট—

—নিঃসঙ্কোচে বলো।

—রুচি, আই মিন প্রকাশবাবুদের বাড়ি বেশি যাবেন না।

—পার্টির কি কোনো নির্দেশ আছে?

—ঠিক তা নয়, তবে, উনি অন্য শিবিরের লোক হয়ে গেছেন।

—প্রকাশবাবুর কোনো শিবিরের যোগ্যতা আছে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া এইসব শিবির, ফ্রন্ট, এ জাতীয় কথাগুলো কি এই বার বাদ দেবার সময় আসেনি?

—আমি আপনাকে ঠিক বোঝাতে পারবো না।

—আমরা কেউ কাউকে ঠিক বোঝাতে পারি নি, কেননা নিজেরা কেউ বুঝি নি।

—যাই হোক আপনাকে যা বললাম, আপনি বিবেচনা করবেন, তবে আপনি বোধ হয় জানেন না যে ওঁরা আমাদের সম্পর্ক আর বাঞ্ছনীয় মনে করেন না। অবশ্য তার কারণও যে নেই তা নয়, প্রকাশবাবুর স্কুল আপগ্রেডেড হওয়া চাই, রুচির বিয়ের কথা হচ্ছে,—

—কার?

—রুচির, কাজল সান্যাল বলে একটি ছেলে, যেমন হয় কেরিয়ারিস্ট টাইপ, এম. এ পাশ করে বুঝি এখন কোনো কলেজে পড়ায়, আই. এ. এসের জন্য খাটছে খুব, ছেলেটি ওদের বাসায় যাওয়া আসা করে।

মানব তারপর আবার নানা কথায় ঘুরে গেল। আসন্ন পার্টি সম্মেলন। জোশী রিভিশনিস্ট কিনা, কতখানি রণদিভের নীতি ব্যর্থ হয়েছে সে সব বিষয়ে মানব তার মতামত জানাতে লাগল। সুব্রতর মনে আছে কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে পার্টির নেতাদের রণদিভে-নীতির সম্মুখে বিচলিত অবস্থাটা মানব এবং তাদের বন্ধুরা রীতিমত উৎসাহিত উল্লাসের সঙ্গে মুখে মুখে বিলি করেছে। জোশী নাকি স্বীকার করেছেন, বিচলিত ভগ্নকণ্ঠে, যে পার্টিকে তিনি ভুলপথে পরিচালিত করেছেন। প্রায় যেন মস্কো ট্রায়াল—বুখারিনের স্বীকারোক্তি—মনস্ট্রাসিটি অফ মাই ক্রাইম্ ইন্ ইম্‌মেজারেব্‌ল। কে জানে এই রাতারাতি স্বীকারোক্তির তাৎপর্য কী—

মানব বলেই চলেছে—শ্যামলদাকে মনে আছে? আজকের—'বাজারে' শ্যামলদার একটা ফিচার বেরিয়েছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্ব। ভেতরের অনেক কথা ফাঁস করেছে শ্যামলদা।

—শ্যামলদা কোথায় এখন?

—দি. পি.তে মাস্টারি নিয়ে চলে গেছে, রটিয়ে বেড়াচ্ছে বাংলাদেশে

থাকলে কমিউনিস্টরা এ্যাসল্ট করবে ওকে। সেখান থেকে ওর স্মৃতিকথা লিখবে। আই. বি. ডিপার্টমেণ্টের মতো পুঁজিবাদী কাগজগুলোতেও এখন একটা করে সি. পি. আই. একসপার্ট থাকবে। এই আর এক জঞ্জাল; দলের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার কলকাতা কংগ্রেসের পর বাজারে আলোচনার বিষয় হয়ে পড়ে কত চট করে। যে মিটিং প্রাদেশিক কমিটির কয়েকজন সদস্যের মধ্যের ব্যাপার তাও খবরের কাগজে চলে যায়।

—শ্যামলদা আসলে সেন্ট্রাল ইণ্টেলিজেন্সের লোকই ছিল। মানব বলল।

এখন তাই ভাবছে বুঝি সবাই?—সুব্রত জিজ্ঞাসা করল।

একটু উত্তেজিত গলায় মানব বলল—আপনি তা ভাবছেন না?

সুব্রত বলল—দায়িত্ব সমান সমান বলে মনে হয় না তোমার? আমি তো তাই ভাবি।

মানব চুপ করে গেল। সুব্রত বুঝতে পারছে যদি সে এখনও পার্টি সদস্য হত তা হলে মানব একটা উত্তর দিত—পার্টির সমষ্টিবোধের কাছে আপনার 'আমি'টার দাম কী?

স্টেশন ব্রিজের কাছে এসে মানব বলল—প্রকাশবাবুদের সম্বন্ধে আপনার কী মনে হল?

—কিছুই মনে হল না। নিরাপত্তালোভী মধ্যবিত্ত এই কথাটুকুতে যতটুকু বোঝায় তার বেশি কিছু নয়। সে তো তুমিও আমিও—কে নয়? বিশুদা, বল কাকে বাদ দোব?

—আর রুচি?

—রুচি? রুচির কথা তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন জানি না, তবে আমি খুব ভাল করে জানি তুমি রুচিকে যা ভাবছ সে তা নয়। কিছুতেই নয়।

—আপনিও দেখুন, আমরাও দেখি। কাল আসছেন?

—হ্যাঁ দুপুরের দিকে আসব।

মানব চলে গেল। সুব্রত বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইল। রুচির কথায় এত জোর দেওয়া হয়তো উচিৎ হল না।

বাড়ি ফিরে সুব্রত দেখল, রুচির একটা চিরকুট অপেক্ষা করছে—একবার আসবেন, বিশেষ দরকার।

আর নন্দিনী বসে আছে—আমার অনেক কথা আছে, আজ আমি বলব। সুব্রত বলল—আগে খেতে দাও। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। প্রিয়ব্রত বাড়ি আসে নি এখনো।

চতুর্থ অধ্যায়

নন্দিনী ভাত বাড়তে বসল। সুব্রত মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গেল। মা বলল—তোর আক্কেল বিবেচনা কোনোদিন হবে না। একটা খবর তো পৌঁছে দিবি কাউকে দিয়ে। তুই আমার জন্য ভাববি সে আশা আমি করি নে, কিন্তু আমি যে তোর জন্য ভাববো সেটা তো ভাববি একবার। সুব্রত সেই ছোট বেলায় যা বোঝাতো মা-কে এখনো তাই বোঝালো। 'আমার কিছু হলেই তুমি ঠিক খবর পাবে, খবর না পেলেই বুঝবে ঠিক আছি'। উঁচু টুলটার ওপরে পেতলের পিকদানিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ সুব্রতর মনে হল কারো কথা শোনার দরকার নেই—কোথাও কারো কাছে যাবারও দরকার নেই—এই ঘরখানায় মায়ের ময়লা বিছানায় পায়ের দিকে কুঁচকে কুঁকড়ে শুয়ে পড়াই ভালো। ভালো—শুয়ে শুয়ে দু-চোখে ঘুম আনতে আনতে মায়ের বিড় বিড় বকুনি শোনা। কী বলছিল মানব ও-সব। কী হবে জেনে কাকে বলে পেটি বুর্জোয়া ডিভিয়েশন—কমরেড ডিভিয়েশন। কতবার এই কথাটা মুখে মুখে এঁটো হয়ে চিবিয়ে ছিবড়ে হয়েছে। এখনো যেন স্বাদ যায় নি। ডিভিয়েশন কথাটা যেন ঐ পিকদানির মতো—প্রচণ্ড বুকচাপা কাশ-কষ্টের পরের মুক্তি ওখানে। মা বিড় বিড় করছে, করুক। জীবনের হিসেবে পিকদানির সঙ্গে ফুলদানির তফাৎ কতদিনের—মনে হয় ফুলদানিটাই যেন চলতে চলতে দুমড়ে গিয়ে পিকদানি হয়ে যায়। এই মাকেই তো সে দেখেছে বাবার বৈঠকখানায় গানের জলসার আগে মেয়েলি নরম হাতে ফুলদানি সাজাতে। আজ স্থূল কাঁপা-কাঁপা হাতে পিকদানি তুলছে মুখের কাছে। কয়েক বছরের তফাৎ মাত্র—একই জীবন অথচ। পিকদানিকে যে আকারই দেওয়া যাক—তাকে দেখে এ কথা কখনোই মনে হয় না, যে, ফুলদানির আর পিকদানির মূল উপাদান একই ধাতু। এমনি করে তারো কি সব পিকদানিই হয়ে যাবে?—সেই একই ধাতু, একই কারিগর, একই অধ্যবসায়, একই শ্রম,—

শুধু ব্যর্থতার হেরফেরে, যা ছিল একদিন প্রেরণা, আজ শুধু তা ক্লেদ মুক্তির পাত্র! অবদ্ধ জলার মতো বিড় বিড় করছে যত ব্যর্থতার বকুনি। কোথা থেকে যে আসে এসব কথারা—

—কী তোমাদের সংসার। নন্দিনী কেন সন্ধ্যে বেলায় শাঁখ বাজাতে ভুলে যায় রোজ। দোরে, চৌকাঠে গঙ্গাজল পড়ে না। তুলসী গাছে বোশেখ মাসে ঝারা বাঁধা হয় না। কেন ছোট বৌমা অফিসের চড়ে কুঁচিয়ে শাড়ি পরে সংসার করে—যেন সব সময়ই ট্রেন ধরছে। এমন করলে লক্ষ্মী থাকে!

কম বাতির আলোটা ঘরখানাকে যত নিথর করে রাখতে চাইছে ততই যেন কোথা থেকে আসছে সেপ্টেম্বরের কঠিন গুমোটের ছটফটানি। সুব্রত তবু যেন এখানেই আত্মসমর্পণ করতে চায়—দুঃখ অনেক ছোট এখানে। ছোট বলেই তাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায়। আর যাকে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় তাকেই হাত বুলোনো চলে। মা থেমে থেমে বলেই চলেছে—বেশ তো যা খুশি করোগে তোমরা। কিন্তু অন্তত নিজেরা সুখে থাকো। তা নয়, তোমাদেরও তো দেখি অশান্তির শেষ নেই। ছোট বৌমা কাঁদে কেন? প্রিয়ব্রত কী বলে ওকে?

স্থূল শরীর নিয়ে মা হাঁফাতে লাগল। বসে বসে বুকে বালিশ দিয়ে সারা রাত এই বুড়ি জেগে থাকবে। আর ভাববে এই সব। কপালে ঘাম জমছে। নাকের দুই প্রান্ত ফুলে ফুলে উঠছে। বাবার ছবিটা শুধু ছবি বলেই শান্ত হয়ে রয়েছে।

নন্দিনী ডাকল, খেতে আসুন।

খেতে বসে সুব্রত দেখল নন্দিনী অসামান্য গম্ভীর। চোখের কোল দুটো যেন ফুলেছে। সুব্রত জিজ্ঞাসা করল—মা কিছু বলেছে?

—না, মায়ের বলায় কী হয়। মা সেভাবে কিছু বলেনও না।

—তবে?

—ও ভয়ানক অবুঝ। ঘাড় ফিরিয়ে নিল নন্দিনী। তারপর বলল, খেয়ে নিন বলছি।

(ক্রমশ)

জর্জ সেফেরিস্

নাবিক

অপরিচিত, আর শত্রুর নির্লজ্জ প্রলোভন
আমরা দেখেছি তাকে জলের নগ্ন দর্পণে।

কিন্তু ওরা যে বন্ধু, মিতাচারী নম্র বালক
কোনদিনই করেনি অভিযোগ, কেননা
ওরা যে ক্লান্ত, তৃষিত, হিমেল।
বৃষ্টি আর ঝড়, রাত্রি আর সূর্যে
ওদের স্বভাব অরণ্য আর ঢেউয়ের,
তাছাড়া পরিবর্তনের চরম মুহূর্তেও
ওরা অপরিবর্তিত, তীক্ষ্ণ ঋজু।
নম্র নতচোখে মসৃণ দাঁড়ের ওপরে ওরা ঘাম ফ্যালে,
দাঁড়ের নানান ছন্দে একসাথে শ্বাস নেয়
দাসত্বের কড়া চামড়ায় ফুটে ওঠে রক্তরেখা।
নম্র নতচোখে ওরা আবার গান গায়:
আমরা যখন আরেবিয়ান পণ্য নিয়ে পাড়ি দিই
নির্জন সমুদ্রদ্বীপ
অন্তরীপ থেকে অন্তরীপের অতলান্তে,
বেলাশেষের সূর্য যখন ঢলে পড়ে
প্রতিধ্বনিত হয় ওদের দাঁড়ের শব্দ
সূর্যের গভীরে, সমুদ্রের স্বর্ণিল পথে।

কত দ্বীপ কত অন্তরীপ পেরিয়ে এলাম
কত সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে, আহা, কত না সমুদ্রপাখি
সামুদ্রিক মাছের নানান বাহার।
হতভাগ্য কত নারী বিলাপের অশ্রু ঝরালো তাদের

হারানো শিশুর স্মৃতিতর্পণে,
অন্য পুরুষেরা বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে চেয়ে ছাখে
আলেকজাণ্ডার কিংবা ধ্বংসোন্মুখ এশিয়ার লুপ্ত গৌরব।
তারপর উপলে, সমুদ্রসৈকতে আমরা নোঙর ফেলি
রাত্রির স্নিগ্ধ গন্ধে, কাকলিমুখর পাখির মিষ্টি গানে,
বিশাল পবিত্র একটি নিয়তির সঞ্চয় করপুটের স্খলিত জলে।

তবু বিশ্রাম ছিল না অন্তহীন দীর্ঘ পরিক্রমার :
কেননা ওদের সবকটি হৃদয় একসাথে গাঁথা
কয়েকটি দাঁড় আর মাস্তলের লৌহশৃঙ্খলে,
চিত্রিত পোতাগ্রের তীক্ষ্ণ কঠোরতায়
হালের বুকফাটা কান্নার তীক্ষ্ণ আর্তনাদে
প্রতিফলিত ওদের মুখ জলের নগ্ন দর্পণে।
তারপর নম্র নতচোখে সাথীরা একদিন মারা গেল :
তাদের সে দাঁড় এখনো চিহ্নিত করে
নীল নির্জন সমুদ্র সৈকত
যেখানে ওরা চিরদিনই নিদ্রালস, নিস্তব্ধ নিথর।

আজ আর কোনো স্মৃতি নেই
কেউ আর স্মরণ করবে না তাদের যে পবিত্র স্মৃতিমুখ,
কয়েকটি শব্দ এখন শুধু নিস্তব্ধতায় অমিত সম্রাট।

অনুবাদ : অমিত সরকার

র্জ সেফেরিস্

আনন্দের পালা

সেদিন সারাটা সকাল আমরা খুশিতে ছিলুম
আ, কতখানি যে খুশি ছিলুম!
প্রথমে নুড়িগুলি, তারপর পাতাগুলি, ফুলগুলি
আর তারও পরে সূর্য ঝকঝক করে উঠল ;
একটা বিরাট সূর্য কাঁটায় আকীর্ণ, কিন্তু নীলিমায় কত উঁচুতে।
একটি পরী আমাদের দুঃখগুলি কুড়িয়ে নিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দিল

জুডাস গাছের অরণ্যে।
কন্দর্পদেব অরণ্যদেব সকলেই খেলছেন, গান গাইছেন ;
আর দেখতে পেতে
কালো লরেল গাছের গোলাপী ডালগুলি
কচি ছেলেদের গায়ের মতো।
সারা সকাল আমরা খুশিতে ছিলুম।
অতল গহ্বর আবৃত কুয়োর মতো
মাথার ওপরে শিশু অরণ্যদেবের কোমল পদাঘাত।
তার হাসি মনে করতে পার ? আ, কতখানি খুশি যে ছিলুম!
তারপরই মেঘ, বৃষ্টি আর ভিজে পৃথিবী।
যখন তুমি কুটিরের মধ্যে শুয়েছিলে,
চেয়ে দেখলে একটা জ্বলন্ত তরবারি নিয়ে খেলা করছেন
পরমতম দেবদূত।
তা দেখেই হাসি তোমার উবে গেল।
"বিশ্রী", তুমি বললে, "এটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।
মানুষদের আমি বুঝতে পারি না :
যতই রং নিয়ে মাতামাতি করুক না কেন
তারা সকলেই কালো।"

অনুবাদ : শিবশম্ভু পাল

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

সিঁড়ি

সিঁড়ি শেষ হলে ফের বাঁক নিয়ে সিঁড়ি শুরু হয়,
কোথাও প্রবেশ নেই। ভেসে আসে উৎসবের গান।
সময়ের হাতে আঁকা দেয়ালে দেয়ালে অবক্ষয়;
পেছনের ধাপগুলো নিষ্ফল তিমিরে মজ্জমান।

কাদের অস্ফুট স্বরে, ইতস্তত আলোর সংকেতে
সন্তপ্ত চরণে শুধু অন্তহীন সিঁড়ি ভেঙে চলি;
কেউ পথ দেখাবে না, নিরুপায় দুই হাত পেতে
বিনাপ্রতিশ্রুতি নেব আতঙ্কিত জন্মের অঞ্জলি।

দেখা নেই যে আমায় এ বাড়িতে এনেছিল ডেকে;
তার নাম, তার মুখ মনে নেই। ব্যর্থ প্রতারিত—
রক্তের গোলাপ হতে শতাব্দীর শাপে একে-একে
দলগুলি ঝরে যাবে, স্মৃতি হবে কীটদষ্ট: মৃত।

এবাড়ির কোনোখানে সারারাত চলেছে উৎসব;
সিঁড়ি ভেঙে যাই একা কাঁধে নিয়ে প্রাক্তনের শব॥

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

শিল্পী

আমারই রচিত দুর্গ চূর্ণ করে তীব্র পদাঘাতে
চলে যেতে চাই দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে বারংবার।
শিল্পের অমল আত্মা কে পারে স্পর্শিতে যার হাতে
নেই সেই মায়াদণ্ড, যার বলে জলধি অপার
ছেড়ে দেয় পথ, প্রতিবন্ধকেরা গর্জায় নিষ্ফল।
এবং অমরতার সুকঠিন দরজা যায় খুলে,
যার হাতে মায়াদণ্ড পরিতৃপ্ত সে পানে গরল,
স্বর্গ মর্ত্য পাতালে ভবিতব্য সে গাঁথে ত্রিশূলে।
নিজেরই রচিত সীমা এক হাতে ভাঙি, অন্যহাতে
আমার সর্বস্ব দিয়ে গড়ে তুলি আত্মার প্রতিমা।
মরণ ঘনায় দেহে, ঝুলে পড়ে কালের আঘাতে
চোয়াল নাসিকা জিহ্বা, হাড়-মজ্জা, পরমায়ু-সীমা
যা দেখে স্তম্ভিত মৃত্যু সে নহে চরম সর্বনাশ
শিল্পের শাশ্বত লোকে প্রতিষ্ঠিত আমার বিশ্বাস।

রণজিৎ সিংহ

চিহ্ন

১. প্রথম আলাপ

গ্রে স্ট্রীট পার হয়ে
আমরা খালের দিকে পা বাড়ালাম
আকাশ ডানা মেলল
ঝলকে উঠল ঠাণ্ডা ধারালো মস্ত চাঁদ
মাঘী পূর্ণিমার চাঁদ!

কথায় জোয়ার লাগল,
অথই কথায় আমরা পাড়ি দিলাম ;
বেলগাছিয়ার ব্রিজে খেলছে কলকাতা
কলকাতা নাচুক।
আমরা পৌছলাম সারি দেওয়া গাছের গম্ভীর নীরবতায়

আলো ছায়ার জাফরি
রোমকূপে ধ্বংসনগরীর মায়া
শূন্যে টলমল জ্যোৎস্না।
আমাদের বাঁধভাঙা মাতাল তাজা হৃদয়ে হৃদয়ে
উচ্চারিত হল সন্ধি।

২. ফুলের বাগান

ওই তো ফুটেছে লাখে লাখে
হাওয়ায় দুলছে রোদে জ্বলছে
এধারে ওধারে হাসছে
মরশুমী ফুল।

কিন্তু কথা মানো যাব না ফুলের মেলায়
কথা মানো চলো ওই ঘাসের রিক্ততায়
দিগন্তকে আড়াল করো
আকাশকে আড়াল করো
আমার দৃষ্টি তোমাকেই বিঁধুক তোমাতেই উড়ুক

বসন্তের তাবৎ চক্রান্ত ফেঁসে যায়
এই তো পেয়েছি রক্তমাংসের ফুল।

৩. মেঠো রাস্তা

আকাশকে বুকে টানি
শরীরে ভাঙি ঝোড়ো হাওয়া

উত্তাল কবিতায় ভ'রে তুলি মাঠ।
ফিরছি লোকালয়ে,

আমাদের সন্ধিতে এ জয়যাত্রা।

জয়যাত্রার নিশান ওড়ে লাল আকাশে
খবর ছড়ায় পাখিদের চিৎকারে।

৪. ঘর

তোমরাও এস—
এস চৈত্রদিন
এস ফুলের শোভা
এস উঠোনের চড়াই
তুমিও এস আমার মা মনি ;
হও খুশির ঝরনা ;
দেখ দেখ
আমার ঘরে এল
আনন্দিত দিন
আমার ভালোবাসা।

সমরেশ রায়

কেউ

দেবব্রত নামে তেইশ বছরের সেই যুবকের যক্ষ্মা হয়েছিল। যৌবনে প্রবেশের মুখে তার গলা দিয়ে রক্ত পড়েছিল। সাদা এ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে, লাল রঙের নিজের শিরা ধমনীতে প্রবাহিত, হৃদপিণ্ড নামক একটি শারীরিক যন্ত্রের অলিন্দ ও নিলয় নামক দুইটি কক্ষ ধুয়ে আসা—এবং হৃদয়—সেই রক্তিম তরল পদার্থ মুহূর্তের মধ্যে দেবব্রত নামক যুবকের ভবিষ্যতের সমস্ত পরিকল্পনাকে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। দেবব্রত নিজেকে এই আকস্মিকতার আঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি।

দেবব্রতর কেন যক্ষ্মা হল এই আলোচনায় সে নিজের মতামত ব্যক্ত করে নি; স্বাভাবিকভাবেই যে কারণগুলো আবিষ্কৃত হয়েছিল, তার মধ্যে প্রায় সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত কারণগুলির মধ্যে দেবব্রতর অনিয়ম অত্যাচার ইত্যাদি-ই প্রাধান্য পেয়েছিল। দেবব্রত এই কারণগুলিকে অস্বীকার করে নি। কিন্তু সে নিজের মনের কাছে অসুখের মূল কারণ নির্দেশে কোনো ফাঁকি রাখে নি।

যক্ষ্মা হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার অনেকদিন পরে দেবব্রত নিজেকে পরিবারের মধ্যে সমস্যা হিসেবে আবিষ্কার করে লজ্জিত ও মনে মনে ক্ষুব্ধ হল। দেবব্রতর বাড়িতে মাত্র দুটো ঘর। তার অসুখের আগে এই দুটো ঘর কখন ছ-জন কখন আট-দশজন মানুষকে মোটামুটিভাবে ধরে যেত; কিন্তু হাঁসপাতাল থেকে প্রত্যাবর্তনের পরে, একটি ঘর শুধুমাত্র দেবব্রতর জন্য ছেড়ে, বাকী একটি মাত্র ঘরকে তার দুই বোন একটি ভাই বাবা-মা সহ—পরিবারের অন্যান্য সবাই আশ্রয় করলেন। অথচ দেবব্রতর ঘরে আরো দু-তিনজন মানুষের জায়গা হতে পারে। কিন্তু সদ্য হাঁসপাতাল ফেরৎ দেবব্রতর তখন অন্য কারো সঙ্গে একই ঘরে থাকা সম্ভব ছিল না। কারণ এতে তার নিজের শারীরিক ক্ষতি হবার অকারণ ভীতি ছিল (স্যানোটোরিয়াম প্রত্যাগত সবাই নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে আশ্চর্য সচেতন; ও স্বার্থপর) তেমনি তার

সঙ্গে একই ঘরে স্ব ইচ্ছায় থাকবার মতো কাউকে পাওয়াও কষ্টকর ছিল। কারণ সদ্য হাসপাতাল ফেরৎ দেবব্রতর যক্ষ্মা নামক অসুখটি সম্পর্কে অন্য সবার ভীতি থাকাও অত্যন্ত স্বাভাবিক। যদিও তার কাছে হাঁসপাতাল থেকে দেওয়া দুটো লাংস-এর ছবিওলা এবং তাতে তার অসুখের প্রথম অবস্থা ও সেরে যাবার পরের অবস্থা পেন্সিল দিয়ে আঁকা আছে এবং সেখানে ছাপার অক্ষরে এ কথাও লেখা আছে যে সে নির্ভয়ে সবার সঙ্গে মিশতে পারে এবং তার থেকে কোনো ক্ষতি হবার সম্ভাবনা নেই, তবুও দেবব্রতকে সামাজিক পরিবেশে মেশবার মতো মানসিক প্রস্তুতির জন্য চেষ্টা করতে হয়েছে, ফলত তার মধ্যে কতগুলো বিচিত্র ধারণা দানা বেঁধে উঠেছে। অথচ এই বিচিত্র ভাবনাগুলো দেবব্রতর মধ্যে হাঁসপাতাল থেকে ফিরে আসবার পর প্রথম বেশ কিছুদিন ছিল না। এই ধারণাগুলোর সঙ্গে—আমি সবার করুণার পাত্র কারণ আমার যক্ষ্মা হয়েছিল—এই বিশ্বাস মিশ্রিত হয়ে দেবব্রতর মানসিকতায় এমন এক আলোড়ন আনল যে দেবব্রতর চোখে সব ঘটনার রঙই পাল্টে গেল। এর পাশাপাশি এবং প্রায় পরপর ঘটে যাওয়া কতগুলো ঘটনা দেবব্রতকে এই বিচিত্র ধারণার ঘূর্ণিতে ঠেলে দিল। ফলে দেবব্রত একটি বুদ্ধিমান যুবক হওয়া সত্ত্বেও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে নিজেকে বাইরের জগৎ থেকে গুটিয়ে আনতে চাইল। যা তার স্বভাব বহির্ভূত। এই গুটিয়ে আনার প্রবণতা সব সময় সার্থক হয় নি। সে তার মনের তাড়নায় স্বনির্মিত জালের আবরণকে বারবার ভেঙেছে এবং কোনো ঘটনাকে ভুল অর্থে নিয়ে আবার সেই আবরণ তৈরি করতে চেয়েছে। স্যানোটোরিয়াম থেকে ফিরে দেবব্রত প্রাণপণে নিজের প্রায় এক বছরের স্যানোটোরিয়াম-জীবনকে—যেখানে মুহূর্ত বছরের মতো এবং প্রতিটি দিন জীবনের মতো দীর্ঘ—ভুলতে চেয়েছিল—এবং অসুখটাকেও। এবং সে তার পরিবার ও বন্ধু বান্ধবীদের সহায়তায় নিজেকে প্রায় বুঝিয়ে এনেছিল যে যক্ষ্মা হওয়া তার কোনো অপরাধ নয়, এবং এই অপরাধের ফল তাকে সারা জীবন ধরে ভোগ করতে হবে না। কিন্তু দেবব্রতর মনে এই অসুখের ফলে যে তীক্ষ্ণ অনুভূতির জন্ম হয়েছিল সেই অনুভূতিই তাকে এই স্বাভাবিকতার দিকে যেতে দিল না। ফলে যে দেবব্রত কোনো মতেই পরিবেশ নামক অদৃশ্য শক্তির শীকার হতে চাইছিল না—যা প্রায় প্রতিটি যক্ষ্মা রোগীই হয়ে থাকে—সেই দেবব্রতই নিজের অজান্তেই মনের বিশেষ ধারণার চাপে নিজেকে পরিবেশের জালে বন্দী করেছিল। ফলে তার

মনে বিভিন্ন ঘটনা ভিন্ন অর্থ নিয়ে উপস্থিত হল। ফলে প্রতিটি মুহূর্তেই সে নিজের বিশ্বাসের মৃত্যু দেখতে লাগল। এবং এই মৃত্যুর কাছ থেকে পালাতে গিয়ে সেই অদৃশ্য জালের দিকেই প্রায় অনিবার্যভাবে এগিয়ে যেতে লাগল।

অসুখ ইত্যাদির বিচার করে এখন দেবব্রত নিজের দুটো জীবন দেখতে পায়; এবং এই দুটো জীবন যক্ষ্মা নামক রোগ দ্বারা অত্যন্ত মোটা করে ভাগ করা। একটি জীবন থেকে আর একটি জীবনে উত্তরণের মধ্যবর্তী সময় প্রায় এক বছর—এই দাগটিকে রঙের প্রলেপ দিয়ে সযত্নে আঁকা হয়েছে। অর্থাৎ দেবব্রত নামক যুবক, এক বছর ধরে যক্ষ্মা রোগে ভুগে তার প্রায় তেইশ বছরের জীবনকে দুটো স্পষ্ট ভাগে ভাগ করেছে।

যক্ষ্মা হবার আগে দেবব্রত প্রচণ্ড খাটত, প্রচুর সিগারেট টানত, প্রচুর চা খেত, প্রচুর আড্ডা মারত, প্রচুর তর্ক করত এবং প্রায়ই রাত জাগত; এবং সে নিজেকে একটি বিশেষ আদর্শের জন্য উৎসর্গীকৃত মনে করত। এই এতগুলো প্রচুরকে সে তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার অঙ্গ করে নিয়েছিল, তখন এই প্রচুরগুলোর একটিকেও বাদ দিলে নিজেকে তার অপূর্ণ মনে হত। এবং এই অসুখ হবার অনেক আগে থেকেই দেবব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে এই প্রচলিত সমাজব্যবস্থার—যার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত—প্রতি বীতস্পৃহতার ফলে নিজেকে ইতিহাসের দ্বারা স্বীকৃত নতুন এক সমাজব্যবস্থার জন্য প্রস্তুত করেছিল। এবং মনে মনে কখনও দু-চারজন বন্ধুবান্ধব এক সঙ্গে সোচ্চারে প্রতিজ্ঞা করত। ছাত্র বা নবযৌবনসুলভ রোমান্টিকতা থেকে যার জন্ম—যে তারা তাদের আদর্শের জন্য প্রাণ দেবে এবং তাদের বুকের রক্ত দিয়ে এই সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করবে, এবং তাদের মধ্যে দেবব্রতই প্রথম প্রয়োজনের আগেই বুকের রক্ত মুখে তুলেছে। অথচ তখন ইতিহাস রচনা করবার মতো ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে মাত্র। বুকের রক্তের চেয়ে তখন সম্পূর্ণ কর্মী মানুষটাকেই দরকার। দেবব্রত এমন একটি পরিবারের সভ্য যে পরিবারের অর্থনৈতিক কাঠামো মাত্র দেবব্রতর অসুখ হবার জন্যই ভেঙে গিয়েছিল। এক দেবব্রত নিজের অসুখের ফলে তার ভেঙে-পড়া পারিবারিক অবস্থা দেখে প্রায় নির্লিপ্ত। যার জন্য অসহায়তার থেকে হবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হল এবং সমাজ এবং অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে পড়ল।

কিন্তু নিজের বুকের রক্ত মুখ দিয়ে তুলে দেবব্রত তার জীবনকে সম্পূর্ণ

অন্য এক পথে, নিয়ে যেতে বাধ্য হল। অথবা তার অসুখই তাকে এই নতুন পথে নিয়ে এল। যে দেবব্রত পরিবারের ভরসা ছিল সেই দেবব্রত এই অসুখের ফলে পরিবারের সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। নিজের অজান্তেই তার মনে এই সমস্যা হয়ে দাঁড়ানোর ফলে ধীরে ধীরে নিজের সম্পর্কে এবং পরিবার ও সমাজ সম্পর্কে অসন্তোষ জমা হল। অথচ দেবব্রত প্রাণপণে নিজেকে আগের দেবব্রত করতে চাইত; কিন্তু এ দেবব্রত অত্যন্ত অসহিষ্ণু, এবং তার নিজের সামান্যতম অসুবিধাকে কেন্দ্র করে পরম স্বার্থপরের মতো পরিবারের মধ্যে অশান্তির ঝড় বইয়ে দেয়। ফলে দেবব্রতর মা-বাবা ভাই-বোনেরা সব সময় যেন তার কাছে অপরাধী হয়ে থাকেন। মাসের শেষে টাকার অভাবে ডিম ইত্যাদি কিনতে না পারায় তার বাবা দেবব্রতকে এড়িয়ে যান; দেবব্রতর মা এসব সময় নিজের হাতে তাকে খাবার দিতে আসেন না। ফলে দেবব্রতর ভাইবোনেরা নিজেদের প্রয়োজন কমিয়ে কমিয়ে নিজেদের প্রায় অপ্রয়োজনীয় করে তুলেছে।

এই দেবব্রত নামক যুবকটি, যার মনে পরিবেশকে অস্বীকার করবার মতো চেষ্টা থাকা সত্ত্বেও, যে প্রায় পরাজিত, অথচ যার মধ্যে একটি যুক্তিনিষ্ঠ মনের কিয়দংশ এখন বর্তমান, যতই তার পরিবারের কথা চিন্তা করে ততই নিজের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়। তার বাবা যে আয় করেন তাতে স্বাভাবিক অবস্থাতেই মাসের পঁচিশ তারিখে ধার করতে হত তার ওপরে এখন তার মতো শ্বেত হস্তীকে পুষতে হচ্ছে—শ্বেত হস্তী কথাটা দেবব্রতর মা তাকে আদর করে গালাগাল দেবার সময় ব্যবহার করেন, দেবব্রত মাঝে মাঝে নিজের সম্পর্কেও এ কথা ব্যবহার করে হাসে—কাজেই এখন মাসের পনেরো তারিখেই ধার করতে হয়। এবং সে নিজেকে বাঁচানোর জন্য পরিবারকে এবং ছোট ভাইবোনদের বঞ্চিত করছে এ ধারণা এখন তার মনে দানা বেঁধেছে।

এ কথাগুলো চিন্তা করলে দেবব্রত নিজেকে অত্যন্ত অসহায় অবস্থায় দেখে; অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার ফলে দেবব্রতর মনে দুঃখজনক ভাবে কিছু ক্ষুদ্রতা দেখা দিয়েছে। অথচ দেবব্রত এমন একটি যুবক যার কাছে যুক্তি অনেক বড় হয়ে দেখা দেওয়া উচিত; কারণ দেবব্রত যে আজকের জন্য নিজেকে উৎসর্গীত মনে করে সেই আজকের মধ্যে নিজেকে এবং অপরকেও ভুল বুঝবার সুযোগ নেই। অথচ পরিবেশের কাছে আত্মসমর্পনের ফলে দেবব্রত অসহায় হয়ে পড়েছে; যে দেবব্রত এককালের কর্মী সে এখন নিজের

মধ্যে কর্মী মনের সম্পূর্ণ উপস্থিতি সত্ত্বেও কাজ করতে পারে না। যে কোনো কাজেই হাত দিতে যাক না কেন "তুই আবার কেন" বলে যে কেউ তার কাছ থেকে কাজটি নিয়ে নেয়। এরা প্রত্যেকেই দেবব্রতর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। দেবব্রতর যক্ষ্মা হবার ফলে এরা প্রত্যেকেই আন্তরিক দুঃখিত। এরা প্রত্যেকে নিজেকে দেবব্রতর জায়গায় বসিয়ে নিয়েছে। আমি যদি দেবব্রত হতাম তাহলে ইত্যাদি, ইত্যাদি, চিন্তা করেই চারিদিকের দেওয়ালের ক্ষয় দেখে আতঙ্কিত হয়েছে এবং এই ক্ষয়িষ্ণুতা থেকে দেবব্রতকে রক্ষা করতে না পেরে যেন নিজেরাই অপরাধী হয়ে পড়েছে। তাই দেবব্রতকে তারা সবরকম সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে চায়।

অথচ দেবব্রত ইদানীং এদের এই বন্ধুত্বের সততাকে নিজের মনের স্বাভাবিক উদারতা দিয়ে গ্রহণ করতে পারে না। ফলে এই সমস্ত রকম পরিশ্রম বা সামান্যতম কাজ থেকেও দেবব্রতকে এড়িয়ে দেওয়াকে দেবব্রত করুণা বা বন্ধুদের যক্ষ্মা-ভীতি হিসেবে ধরেছে। এই সময় এক বিরাট উৎসব হয়েছিল। দেবব্রত সুস্থ থাকলে সে তার দিন রাত্রের প্রতিটি মুহূর্তকে এই উৎসবের কাজে নিয়োজিত করত। কিন্তু বর্তমানে এই উৎসবে যেখানে প্রতি মুহূর্তে আরো কর্মী দরকার, সেখানে একটি সর্বক্ষণের কর্মী মনের উপস্থিতি সত্ত্বেও দেবব্রত কাজে নামতে পারছিল না। প্রতি মুহূর্তে সে নিজের মনে কাজে নামবার তাগিদ পাচ্ছিল। কিন্তু দেবব্রতর এই কাজে নামবার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং কাজে নামতে না পারার ফলে প্রতি মুহূর্তেই তার মধ্যে একটি অসহায়তার যন্ত্রণা জন্ম নিচ্ছিল। এবং পারিপার্শ্বিক কর্মপ্রবাহের মধ্যে নিজেকে মেশাতে না পেরে সে নিজের প্রতি বিরক্ত হচ্ছিল। এর মূল কারণ হিসেবে তার অসুখকে আবিষ্কার করে দেবব্রত সেই অদৃশ্য শক্তির প্রতি প্রায় উন্মত্ত হচ্ছিল। অথচ প্রত্যেকেই নিজেদের সঙ্গী হিসেবে দেবব্রতকে রাখতে উদগ্রীব। কিন্তু কোনো কাজ না করে শুধু সঙ্গী হিসেবে থাকতে দেবব্রতর প্রচণ্ড অনিচ্ছা। এমন মানসিক অবস্থায় উৎসব আরম্ভ হবার আগের দিন সন্ধ্যাবেলা যখন একটি তোরণ নির্মাণের কাজ চলছিল তখন দেবব্রত সেখানে উপস্থিত ছিল। কোনো এক সময় তোরণটি এমন এক পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াল, যখন সেই তোরণটির একটি বিশেষ দুর্বল স্থানে সেই মুহূর্তে যদি কেউ হাত না লাগায় তাহলে পতনোন্মুখ তোরণটিকে রক্ষা করা যাবে না। সম্মিলিত 'গেল' 'গেল' চীৎকারের মধ্যে দেবব্রত মুহূর্তের মধ্যে সমস্ত বাধা

নিষেধ ভুলে গেল এবং তার কর্মী মন তাকে সেই দুর্বলতম স্থানে হাত লাগাতে বাধ্য করল। এই দুর্বলতম স্থানে হাত লাগিয়েই দেবব্রত হঠাৎ উত্তেজিত হল। কিন্তু দেবব্রতর হাত লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই "তুমি সরে যাও আমি ধরছি" বলে যে-ভদ্রলোক সেখানে হাত দিলেন তিনি দেবব্রত যদি তোরণে হাত না লাগাত তাহলে কোনো অবস্থাতেই এমনকি তোরণটি ভেঙে পড়লেও সেখানে হাত লাগাতেন না।

দেবব্রত সেই মুহূর্তে সেখান থেকে সরে আসল। এবং যে মন থেকে ভদ্রলোক দেবব্রতকে সরিয়ে নিজে সেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেই শুভ ইচ্ছাকে দেবব্রত অন্যভাবে ব্যাখ্যা করল। এবং এই ভদ্রলোক আমাকে করুণা করলেন, সবাই আমাকে করুণা করছে, করে, কারণ আমার যক্ষ্মা হয়েছিল, এমনতর একটা ধারণা মনে নিয়ে দেবব্রত উৎসবক্ষেত্র থেকে বাসায় ফিরল।

উৎসবের এই ঘটনার সঙ্গেই পরিবারে নিজেকে জোর করে সমস্যা তৈরি করে, ভাইবোনদের বঞ্চিত করছি, এই ধারণা মনে নিয়ে যখন দেবব্রতর অস্থিরতম সময়, মানসিক স্থৈর্য যখন ভেঙে পড়বার উপক্রম করছে, তখনও দেবব্রত নিজেকে নিয়ে রসিকতায় হেসেছে। বন্ধুবান্ধবদের তাকে ভয় পাবার কৃত্রিম অভিনয়ে বাসায় তার থালা বাটির স্পর্শ বাঁচানোর অভিনয়ে দেবব্রত প্রাণ খুলে হেসেছে; এবং এই দুই ভিন্নমুখী মানসিক সংঘাতের ফলে অস্থিরতম সময়ে দেবব্রতর সাথে সীমার দেখা হয়েছিল। দেবব্রত সুস্থ হয়ে ফিরে আসবার মাসখানেক বা মাস দুয়েকের মধ্যে সীমার—যে যুবতীকে দেবব্রত স্যানাটোরিয়াম যাবার আগে এবং সেখান থেকে ফেরার পরেও ভালোবাসত—বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সীমার বিয়ে হয়ে যাওয়ার ফলে ভালোবাসার ক্ষেত্রে দেবব্রত আশ্রয়হীন হয়ে পড়েছিল। সীমা—যে একটি বৃহৎ একান্নবর্তী পরিবারের সাত অথবা আট অথবা ছয় ভাই-এর একমাত্র বোন, এবং যার বাবা যে কোনো মুহূর্তেই মেয়েকে পাত্রস্থ করবার পক্ষপাতী—বিয়ে ঠিক হয়ে যাবার পরে এক সন্ধ্যাতে দেবব্রতকে নিজের বিয়ের সংবাদটা অত্যন্ত নির্লিপ্ত-ভাবে দিতে চেয়েছিল; যেন দুপুরে ভাত খেতে খেতে তার গলায় একটা মাছের কাঁটা বে-কায়দায় বিঁধে গিয়েছে এবং প্রতিটি ঢোক গেলার সঙ্গে সঙ্গে গলায় খোঁচা দিচ্ছে; দেবব্রত সংবাদটি এমনভাবে গ্রহণ করল যেন সে প্রতি মুহূর্তে সীমার গলায় বিঁধে থাকা কাঁটাটির খোঁচা নিজের গলায় অনুভব করছে। সীমা দেবব্রতকে—যাকে সে এবং যে তাকে ভালোবেসেছে—তার বিবাহের

সংবাদ এমন নির্লিপ্তভাবে গ্রহণ করতে দেখে, আমার গলায় বিঁধে-থাকা এই মাছের কাঁটা নানাভাবে আমার মৃত্যুর কারণ হতে পারে একথা চিন্তা করেই যেন কেঁদে ফেলল এবং দেবব্রত 'ছিঃ ছিঃ মাছের কাঁটা গলায় বিঁধলে কেউ মারা যায় নাকি', গোছের সান্ত্বনা দিল। ফলে সীমা আরও কাঁদল। এবং একদিন সীমার বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের পর এই প্রথম সীমার সাথে তার দেখা হল। এই দেখা-হওয়া তার মনে আর এক নতুন বিষাদের জন্ম দিল। সীমার সমস্ত গা ভরে কেমন এক নতুন-বৌ সুলভ গন্ধ জড়ানো। প্রায় আগের দিনের মতোই সীমার সঙ্গে দেবব্রত গল্প করল; এবং বিবাহের পর সীমাকে দেখে ভাবল এই সীমা আমার স্ত্রী হতে পারত এবং তাহলে তার এই নতুন-বৌ সুলভ লোভনীয় ভাবের আমিই অধিকারী হতে পারতাম। এবং ইত্যাদি। অনেকক্ষণ গল্পের শেষে সীমা যাবার জন্য উঠে দাঁড়াল এবং যাবার আগে দেবব্রতর খুব কাছে দাঁড়িয়ে বলল "আমার বিয়েকে কিন্তু তুমি অন্যভাবে নিও না। ভেবো না তোমার অসুখই আমার বিয়ের কারণ," এই কথাগুলো শুনে প্রথমে দেবব্রত পূর্ব জীবনের মতো হেসেছিল। মনে মনে বলেছিল সীমাটা একটা পাগল। মুহূর্তের মধ্যে তার মনে হল আমার অসুখটা তাহলে সীমার—অন্যখানে বিয়ে হয়ে যাবার পক্ষে একটা কারণ হতে পারত এবং আমি পাছে এ কথা মনে করি তাই সীমা আমার কাছে নিজের ভালোবাসার সততা প্রমাণ করে গেল। দেবব্রত মনে মনে হেসেছিল। সীমা এখন নতুন-বৌ-এর সুখমায়ায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখে আমাকে—যে আমি সীমাকে ভালোবাসতাম—তার সততার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল। কেন গেল? আমি তো সীমাকে অবিশ্বাস করি নি। আমার মধ্যে তো এ প্রশ্ন এর আগে জাগে নি। উৎসবের যে ঘটনা দেবব্রতর অসহায়তা বাড়িয়ে তুলেছিল, সেই ঘটনাই যেন দ্বিগুণ হয়ে সীমার একটিমাত্র বাক্যের মধ্য দিয়ে ফিরে এল।

অর্থাৎ দেবব্রতর মনে অসুখের ফলে ধীরে ধীরে বিভিন্ন ঘটনার সংঘাতে যে বিষাদের জন্ম হচ্ছিল, সেই বিষাদ সীমার এই কথাগুলোর ফলে আরো বৃদ্ধি পেল। এবং অনেকগুলি ঘটনা মিশে ক্ষেত্রটিকে আরো পিচ্ছিল করে তুলল। ফলে দেবব্রত নামে যে যুবক তার পূর্ববর্তী জীবনে এই সামাজিক ব্যবস্থার প্রতি বীতস্পৃহতার ফলে নতুন আর এক আদর্শের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করেছিল, যে যক্ষ্মা হবার পরবর্তী জীবনে নিজেকে পূর্বতন পরিবেশে

একাকী দেখে অসহায় হয়ে পড়ল; এবং প্রতি মুহূর্তে তার এই অসহায়তা বৃদ্ধি পেল।

দেবব্রত এখন নিজের অজান্তেই নিজেকে পরাজিত নায়ক ভাবে। ফলে এখন সে প্রায়শই যে কোনো আলোচনায় যে কোনো সূত্র ধরে তার স্যানোটোরিয়াম জীবনের কথা আনে। এবং যেহেতু এ বিষয়ে সবারই উৎসাহ আছে এবং যেহেতু দেবব্রতর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে, অতএব অনেকেই নানা রকম প্রশ্ন করে। ফলে যে কোনো আলোচনায় দেবব্রত মুখ্য বক্তা হয়ে ওঠে। তার মূলধন স্যানোটোরিয়ামের একটি বছর—যেখানে কম-বেশি কোনো সময়েরই মূল্য নেই। দেবব্রতর নিকট বন্ধুদের অনেকেই তার এই অসুখের ফলে ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। এবং দেবব্রতকে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ভেবে নিয়ে তার কাছেই কথা জিজ্ঞেস করতে আসে। কারো ওজন কমেছে, কারও বুকে পিঠে ব্যথা, কারো সর্দি ইত্যাদি। এর ফলে দেবব্রত নিজেকে যক্ষ্মা নামক রোগ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেখতে পেল। এবং বন্ধুবান্ধবদের এই ভীতির জন্য সে মূলত নিজেকে দায়ী করল। ফলে অত্যন্ত আশ্চর্যজনকভাবে অসুখ হওয়া ও সেরে যাবার অনেক পরে যক্ষ্মাই তার নিয়ন্ত্রণকর্তা হয়ে দাঁড়াল।

সীমার বিয়ে হয়ে যাবার পর সে মনের ওপর জোর করে একটা পর্দা টেনে দেবার চেষ্টা করল। এবং প্রায় সার্থক হল। কিন্তু তার মনে ভালোবাসার প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। যক্ষ্মা হবার ফলে তার অনুভূতিগুলো তীরের ফলার মতো তীক্ষ্ণ হয়েছিল। সীমার বিয়ে হয়ে যাবার পর বাইরের নানান ঘটনার আঘাতে ও মানসিক অসহায়তা দেবব্রতকে আরো ব্যাকুল করে তুলল। এবং আমি ভালোবাসার ক্ষেত্রে সৎ থাকব এই প্রতিজ্ঞা করে সে স্যানোটোরিয়ামে যে শান্তা নাম্নী রোগিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তাকে ভালোবাসায় স্বীকৃতি দিল না। শান্তা স্যানোটোরিয়ামের পরিবেশের একাকীত্বের এবং অসহায়তার পশ্চাৎপটে আমাকে দৈহিক আকর্ষণ করেছিল। দেবব্রত শান্তার দেহকে উপভোগ করেছিল কিন্তু তবুও সে তাকে ভালোবাসার স্বীকৃতি দিতে রাজী হল না। এবং স্যানোটোরিয়াম থেকে ফিরে আসবার পর ঘটনা পরম্পরায় [illegible] তাকে জীবনের ক্ষেত্রে অসহায় করল। এক নিজের মানসিক অস্থিরতাকে ও ক্ষুদ্রতাকে কোনো এক আশ্রয়ে নিয়ে যাবার জন্যই দেবব্রত ভালোবাসার যন্ত্রণার শরে আহত হল।

অথচ পরিবারে নিজেকে সমস্যা হিসেবে ভেবে নেওয়া, নিজের অর্থনৈতিক পরাধীনতাকে কড়া রঙে চিত্রিত করা; মানসিক উদারতা হারিয়ে নিজেকে প্রত্যেক স্থলে ছোটো করে দেখা ইত্যাদির ফলে সে কেমন যেন ভীতগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলো। দেবব্রত নামে যে যুবক পূর্ববর্তী জীবনে প্রায় দুঃসাহসী ছিল তার এই পরবর্তী জীবনের ভীতি দেখে সে অবাক হল। এবং আশ্চর্যজনক ভাবে লক্ষ্য করল যে তার চারিদিকে কতগুলি বলয় রচিত হয়েছে, এবং প্রতিটি দ্বিতীয় বলয় প্রথম বলয় থেকে বৃহৎ ব্যাসযুক্ত। প্রতিটি ব্যাসের মধ্যে আছে তার মানসিক যন্ত্রণার ফলে জাত বিষাদ। এবং এই বলয় বিষাদ ও অসহায়তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

দেবব্রত হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে গেল—তাকে ঘিরে তার বন্ধুদের একটা ভিড়। সবাই দেবব্রতর অজ্ঞাত কোনো কারণে উত্তেজিত ও উজ্জ্বল।

: দেবু খবর শুনেছিস?

: না কি খবর?

: রাশিয়া আকাশে মানুষ পাঠিয়ে আবার ফিরিয়ে এনেছে। কি যেন নাম রে?

: গাগারিন।

: সে কি রে? দেবব্রতর গলায় বিস্ময় আটকে গেল। চীৎকার করে এই বিরাট সাফল্যকে সম্বর্ধনা জানাতে চাইল। কিন্তু কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে পারল না। দেবব্রত হঠাৎ অবাক হল। এই পৃথিবীর প্রচণ্ড আকর্ষণকে ছাড়িয়ে কী করে একটা মানুষ এই পৃথিবীরই আকাশ থেকে এই তারার মতো পৃথিবীকে দেখছে। দেবব্রত ভাবতে চেষ্টা করল কোন প্রচণ্ড গতি এই মানুষটিকে যার নাম গাগারিন, আকাশের নিঃসীম শূন্যতার মধ্যে ভেসে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছে। এই পৃথিবীর চারিদিকের আকর্ষণের বলয়গুলোকে কী করে সে ছিঁড়ল। দেবব্রত এগিয়ে এলো সবার সঙ্গে মিশে, বন্ধুদের নানা কথা এলোমেলোভাবে কানে আসছে।

দেবব্রত নিজেকে সেই শূন্যে ঘূর্ণায়মান মানুষের সঙ্গে বিরাট শূন্যতার মধ্যে দেখতে চাইল। এই পৃথিবীটা যেন একটা বিরাট তারা। একে ঘিরে নানা বর্ণের মেঘের মালা। এর একদিকে রাত্রি আর একদিকে দিন। কি আশ্চর্য! আমাদের সবার মাঝখানে কালো সুতোর মতো দিনরাত্রির মিলন। এই পৃথিবীর আশ্রয়ে থেকেও, এ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া, অন্য আর এক আকর্ষণে

চলে যাওয়া, এবং ফিরে আসা; দেবব্রত আকাশে তাকাল। তারা অসংখ্য তারা। যেন একটা বিরাট মালা। অথবা একটি ডালাতে এলোমেলো অনেক ফুল। আর এরা প্রত্যেকে প্রত্যেকের থেকে আলাদা অথচ কোন এক অদৃশ্য বিচিত্র আকর্ষণের দ্বারা একে অন্যের সাথে অন্বিত। আমরাও। আমরাও।

দেবব্রত এই উত্তেজনাকে মনে নিয়ে বন্ধুদের মধ্যে মিশে এগোতে লাগল। দেবব্রত আকাশে তাকাল, তারা দেখল, আকাশ—নিজেকে এই পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের দ্বারা আকর্ষিত দেখতে পেল; এবং জীবনের। জীবনের আকর্ষণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত দেবব্রত তার তেইশ বছরের জীবনকে মানসিক যন্ত্রণা থেকে জাত বিষাদের মধ্যে বন্দী দেখে চিন্তিত হল। এবং এই অসহায়তার বন্ধন ছিন্ন করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হল। দেবব্রত সেই গতিকে, যে গতি একটি মানুষকে মহাশূন্যের মধ্যে স্থাপিত করেছে, কল্পনা করতে চাইল এবং নিজের মধ্যে সেই গতির সন্ধানে আকুল হল। দেবব্রতর মনে হল যে ইচ্ছে করলে এই গতির দ্বারা তার চার পাশের বিষাদের বলয় থেকে এবং স্বনির্মিত যন্ত্রণার থেকে বের হয়ে আসতে পারে। এই গতির সন্ধানে সে আকুল হল।

বন্ধুদের সাথে যেতে যেতে দেবব্রত অর্ধেক মন নিয়ে, তার আর অর্ধেক মন তখন আকাশে ঘূর্ণায়মান একটি মানুষের সঙ্গে সে প্রবহমান মানুষের স্রোতকে লক্ষ্য করছিল, এবং এই কয়েক মুহূর্ত ধরে তার অসুখ, অর্থনৈতিক পরাধীনতা, এবং মানসিক অসহায়তাকে ভুলে থাকতে পেরেছিল। প্রবহমান মানুষের স্রোত দেখতে দেখতে দেবব্রত নিজেকে এই গড্ডালিকা প্রবাহের মধ্যে দেখে অস্বস্তি বোধ করল। আমি সকালে উঠে চা খাই, পড়তে বসি, দাড়ি কামাই, স্নান খাওয়া সেরে কলেজ যাই একই কথার চর্বণ করি। বাসায় ফিরি, খাই বিশ্রাম করি, পড়তে বসি, খাই এবং এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়ি, এবং স্মৃতির রোমন্থন করি। এবং আমার সকালে ঘুম থেকে ওঠা ও রাতে শুতে যাবার মধ্যবর্তী মুহূর্তগুলিকে অসহায়তার রঙে চিত্রিত করে দিই। দেবব্রত চোখের সামনে অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলিকে মিলিয়ে যেতে দেখল। এবং হঠাৎ মনে পড়ল স্যানোটোরিয়ামে এক সকালে নিজের ঘর থেকে আকাশে তাকিয়ে থাকতে থাকতে যেন অনেকটা প্রায় মিলিয়ে থাকা বুদ্‌বুদ্ দেখতে পেয়েছিল, এবং সে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করলেই বুদ্‌বুদ্‌গুলো মিলিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু দৃষ্টিকে একেবারে ঢিলে করে দিলেই আবার বুদ্‌বুদ্‌গুলোকে ওপর থেকে নীচে পড়তে দেখছিল, আকাশের গা বেয়ে।

আমার অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলো আমাকে প্রতি মুহূর্তে একটা বেড়াজালের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। দেবব্রত মনে মনে স্বীকার করল তার এই বেড়ার দিকে এগিয়ে না যাবার ইচ্ছাশক্তি ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ছে। ফলে তার চারিদিকে বিষাদভর্তি বলয়গুলো আরও শক্ত হচ্ছে, এবং দেবব্রত নিজের মধ্যে সেই গতির উপস্থিতি দেখতে চাইছে, যে গতি তাকে বলয়গুলো ছিঁড়ে বের করে আনবে। এই গতির কথা মনে আসতে দেবব্রতর এই অর্ধেক মন মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান তার আর অর্ধেক সত্তার সঙ্গে মিলিত হল এবং তার চোখের সামনে আশ্চর্য কমলা রঙের আস্তরণে ঢাকা পৃথিবীটা স্বপ্ন হয়ে উঠল। মহাশূন্যে ঘূর্ণায়মান দেবব্রত অনেক নীচে আকাশে উজ্জ্বলতম তারা এই পৃথিবীর আঘ্রাণ গ্রহণ করল এবং এই আঘ্রাণই তাকে মাটির আকর্ষণে নিয়ে এল ; এই মাটির আকর্ষণ হঠাৎ তার বিষাদ অসহায়তার সঙ্গে মিশে তাকে আবার পৃথিবীর মাটিতে নামিয়ে আনল। দেবব্রত চারিদিকের মানুষগুলোর গায়ে সেই মাটির গন্ধ এবং আকর্ষণের গন্ধ পেয়ে অস্থির হল। এবং একটি প্রচণ্ড গতির দ্বারা তাড়িত হতে চাইল। দেবব্রতর মনে হল— সে যদি অত্যন্ত জোরে একটা দৌড় লাগাতে পারত, এত জোরে যে এই গন্ধগুলি তাকে পশ্চাৎধাবন করতে পারবে না, তাহলে হয়তো সে এই আকর্ষণের বাইরে যেতে পারবে। কিন্তু হঠাৎ দেবব্রতর মনে হল যে স্বপ্ন নামক একটি অসুখ দ্বারা সে নিয়ন্ত্রিত, এবং সে প্রতি সন্ধ্যায় ডিম, দুধ খাবার জন্য বন্ধুদের সঙ্গ ছেড়ে একা একা প্রায় পরাজিত মধ্যযুগীয় বীরের মতো রাস্তার আলোয় নিজের দীর্ঘ ছায়া দেখতে দেখতে বাড়ি ফেরে ; এবং তার এই স্বপ্ন হবার ফলে তাকে কেন্দ্র করে সংসারের মধ্যে সেই কালপেঁচা প্রবেশ করতে চাইছে—যার আগমনে লক্ষ্মীদেবী ফুটপাথে আকাশে পা তুলে চিৎপটাং হয়ে থাকেন।

দেবব্রত চোখের সামনে রাস্তায় লক্ষ্মী ঠাকরুণকে দেখতে পেল। চিত হয়ে পড়ে আছেন। প্রায় নগ্ন দৈবিক মহিমা। শীর্ণ স্তন দুটো ডাইনি বুড়ির মাথার চুলের মতো। পাঁজরের খাঁচার উপর পেঁচাটা একটা শীর্ণ শিশুর রূপ ধরে বসে আছে। দড়ির মতো উরু। দেবব্রত এই লক্ষ্মী ঠাকরুণের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিজেকে নাকে রুমাল দিতে দেখল। দেবব্রত ভাবল আমি যদি লক্ষ্মী হতাম তাহলে···

: দেবু তুই চুপ করে কেন রে ?

: না—কৈ ?

দেবব্রত দেখল সে একটি পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ধুয়া একে অন্যের সিগারেট থেকে সিগারেট ধরিয়ে নিচ্ছে। দেবব্রতর ঠোঁট শির শির করে উঠল, আমি এককালে প্যাকেট প্যাকেট 'চারমিনার' খেতাম। দেবব্রত অতীতের সেই উচ্ছৃঙ্খল যুবকটিকে করুণা করতে চাইল। এবং বুকজোড়া এক আশ্চর্য ব্যথা অনুভব করল, যার অনুভব মাত্র করা যায়, কিন্তু ব্যাখ্যা করা যায় না। দেবব্রত এই ব্যথার তাড়নায় অস্থির হল। পানের দোকানের আয়নায় দেবব্রত নিজের প্রায় রক্তাভ মুখ দেখলো।

: আমি যাই, দেবব্রত হঠাৎ পেছন ফিরল।

: এখনি ? আটটাতো বাজে নি ?

: না ভালো লাগছে না। দেবব্রত এগিয়ে গেল। একদমে অনেকখানি ঠোঁট ভাবলে, এখন কোথায় যাবে, বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। বাড়ি মনেই সেই ঘর। একটি বিছানা, টেবিলে অসংখ্য বই, তাকে পুরনো কাগজের স্তূপ, কেমন পুরনো গন্ধ। দেবব্রত সমস্ত বুক জুড়ে সেই ব্যথাটা অনুভব করল। কিন্তু ব্যথাটা বুকে নয় তা সে জানে। ব্যথাটা ঠিক ব্যথা নয়। কি যেন কেমন যেন।

দেবব্রত একটা পানের দোকানের সামনে দাঁড়াল। সামনের আয়নায় নিজের মুখ দেখতে দেখতে দোকানদারের হাতে পয়সা তুলে দিল।

: পানে কি দেবো ?

: তাজা মসল্লা, এলাচ্, বাবা জরদা।

পান মুখে দিয়ে চুনের বোঁটা হাতে রাস্তায় পা দিতেই দেবব্রতর বুকের সেই ব্যথাটা ছটফট করে উঠল। যেন বুকের খাঁচার মধ্যে বন্দী একটা পাখি উড়তে চাইছে। ব্যথাটা পাখি হয়ে পাঁজরের হাড়ের কাঠিতে ঠোকরাচ্ছে। দেবব্রতর গলার কাছে সমস্ত যন্ত্রণা যেন দলা পাকিয়ে গেল।

দেবব্রত আকাশের কথা ভাবল, একটা মানুষ—গাগারিন—আকাশে ঘুরছে, মাটির গন্ধ, আমি আকাশে গিয়েছিলাম, মাটির গন্ধ, জীবনের আকর্ষণ, আমি পৃথিবীতে নেমে এসেছিলাম, গড্ডালিকাপ্রবাহ, আমি, আমার অসহায়তার রঙে চিত্রিত মুহূর্তগুলো, চারিদিকের বিষাদভর্তি বলয়গুলো চেপে আসছে, আমাকে চারিদিক থেকে এক অসহায়তা ঘিরে ধরছে, আমাকে এই বিষাদের বলয় ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে হবে। এবং দেবব্রতর বুকজোড়া সেই ব্যথা— যা ঠিক ব্যথা নয় কিন্তু কি দেবব্রত ঠিক জানে না—ছটফট করে উঠল। দেবব্রত বুকে হাত দিল এবং হাত দেওয়া মাত্র অনুভব করল বুকের মধ্যে এই যন্ত্রণাই গতি হয়ে যাচ্ছে। দেবব্রতর সমস্ত বুক জুড়ে সেই আশ্চর্য তাড়না।



[বিজন চৌধুরী

মিছিলের শহর

আর এক মিছিল

কাক ডাকার শব্দ শুনে উঠে পড়তে হয়। ঘরের মধ্যে তখনো আবছা অন্ধকার। মনে হয় আর একটু গড়িয়ে নিতে পারলে বেশ হত। কিন্তু পারা যায় না। ওদিকে আবার 'লেট' হয়ে যাবে।

অফিস কাছারি নয়, তবু 'লেট' হবার ভয় থাকেই। দেরী হয়ে গেলে মুশকিল, আর কেউ এসে নিয়ে যাবে। কিংবা হয়তো নষ্টই হয়ে যাবে।

হাতে ঝুড়ি নিয়ে প্রায় ছুটতে থাকে নসীর মা। তারপর ধৈর্যের প্রতিমূর্তির মতো সে হাঁটে।

সামনে এক পাল গোরু কিংবা মোষ। তাদের মাঠে চরতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। পেছনে নসীর মা। এই রকম রোজ। বছরের তিনশ পঁয়ষট্টি দিন।

গ্রীষ্ম বর্ষা শীত—কোনো বাছ বিচার নেই। সকাল বেলা, চারণে যাবার সময়। আবার গোধূলিতে, যখন ওরা ফিরে আসে। সব সময় নসীর মা থাকে পেছনে। না আকাশ তার চোখে পড়ে না। না রুচি তাজা সকাল বেলায়। না গোধূলির স্বর্ণ বর্ণ রঞ্জিত ক্লান্ত সন্ধ্যায়। সময় থাকে না। নসীর মাকে চলতে হয় মাটির দিকে তাকিয়ে। আকাশের দিকে তাকাতে হয় কখনো কখনো—বৃষ্টি এল কি না দেখবার জন্য। অথবা যখন প্রখর রৌদ্রতাপে করুণার লেশমাত্র থাকে না। আর নয়তো একটি দীর্ঘশ্বাস ভগবানের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য। নসীর মার অগাধ বিশ্বাস, ঐ আকাশ ভগবানের বাসস্থান।

তার নিজের বাসস্থান বলতে একটি মাটির ঘর। দেখতে মনে হয়, কোনো কিছুর ভারে নুয়ে পড়েছে। যেমন নসীর মা নিজে। সে কোনোদিন সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত কিনা সে কথা কারও মনে নেই। না তার নিজের, না অন্য কারও। ঘরে তৈজসপত্র কিছু নেই প্রায়। মেঝে থেকে চালা পর্যন্ত স্তূপীকৃত ঘুঁটে। রাশি রাশি। অগুন্তি। তারই মাঝখানে ফুট চারেক জায়গা নিয়ে শুয়ে ঘুমোয় নসীর মা।

নসীর মা ঘুঁটেওয়ালি। মজা এই, যে লোক ঘুঁটে বানায় আর তা বিক্রী করে দিন চালায়, তাদের কোনো নাম থাকে না। পেশাটা প্রায় মেয়েদের একচেটিয়া। ওদের পরিচয় পেতে এবং দিতে হয় কারও মা, কিংবা দিদি অথবা বৌ বলে। নসীর মার জীবনে নসী বলে কেউ কখনো এসেছিল কিনা কেউ হলফ করে বলতে পারে না। তবু তার নাম নসীর মা।

সাল তারিখ এসব তার মনে থাকে না। এইটে শুধু তার মনে আছে, একবার সারা দেশ জুড়ে আকাল এসেছিল। মরণের একটা যেন মিছিল লেগেছিল রাজ্য জুড়ে। রাজার কাছে দুঃখু জানাতে অনেকের সঙ্গে সে-ও এল গ্রাম থেকে এই শহর কলকাতায়। সেখানে কত পাক, কত ঘূর্ণী। কত শত তলিয়ে গেল। নসীর মা পাক খেয়েছিল বটে, ডোবে নি। তারপর সে ঘুঁটেওয়ালি।

সকালে বিকেলে গোবর কুড়িয়ে আনতে হয়। তাতে পাক মেশাতে হয়। করাত কল থেকে নিয়ে আসতে হয় কাঠের গুঁড়ো। ওসব মিশিয়ে ঘুঁটের পরিমাণ যেমন বাড়ে, তেমনি বাড়ে ঘুঁটের দাহন শক্তি। অনেক ঘুঁটেওয়ালি আছে যাদের সঙ্গে খাটাল মালিকদের বন্দোবস্ত থাকে। খাটাল থেকে গোবর নিতে হয় পয়সা দিয়ে। নসীর মার ওরকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

ঘুঁটেওয়ালিদের একটা মস্ত সমস্যা হল ঘুঁটে শুকোনো। সব জায়গায় সেটা সম্ভব হয় না। ওর জন্য দরকার হয় পোড়ো বাড়ি, কিংবা ছুটকো বাড়ির দেয়াল। আর নয়তো রেল লাইনের ধারে চওড়া জায়গা। এমনি হাজার হাঙ্গাম হুজ্জুত করে তবে তৈরি হয় ঘুঁটে—শহর কলকাতার হাজার হাজার সংসারের একটি মূল্যবান জ্বালানি।

নসীর মায়েরা এই শহরে আছে কয়েক শত। তারা কারও কাছে হাত পাতে না। আপন পেশা অনুসরণ করে তারা স্বাবলম্বী। মেহনতের মূল্যে তারা মূল্যবান।

মধ্য কলকাতার একটি বই-এর দোকানের পাশে একখানা ক্ষুদ্র ঘরে একদিন সহসা দেখতে পেলাম, একটি বিধবা মেয়ে সদ্য-ছাপা কাগজ ভাঁজ করছে বসে বসে। ওটি এক পাবলিশারের দোকান। নানা ইস্কুল আর কলেজের বই ওখান থেকে প্রকাশ হয়।

বই প্রকাশের নানা ব্যাপার। লেখক তা লেখেন। ছাপাখানায় সেই লেখা ছাপা হয়। তারপর তার সেলাই বাঁধাই। সবশেষে পুরো বইখানা তৈরি হয়ে আসে দোকানে।

বই বাঁধাই-এর কাজটা মুখ্যত পুরুষের কাজ। আগে তো জানাই ছিল না, এ কাজে মেয়েরাও হাত লাগিয়ে থাকেন। এখন শোনা গেল, শুধু হাত লাগানো নয়, এ কাজে মেয়েদের সংখ্যা প্রচুর। আর তা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মেয়েরা এ কাজে বেশ নিপুণ। তাছাড়া, সব থেকে বড় কারণ হল মেয়েদের দিয়ে কাজ করালে মালিকদের পয়সা খরচ অনেক কম।

বই বাঁধাই-এর কাজ করে থাকেন এমনি একটি মেয়ের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেল, তাঁর নাম পারুল। তথাকথিত ছোট জাতের মেয়ে নন, পদবিতে মিত্র।

সংসারে আর কে আছে ?

—একটি সন্তান।

স্বামী তার নিরুদ্দেশ। বাড়ি ছিল পাকিস্তানে কিন্তু রিফিউজি সার্টিফিকেট হারিয়ে গেছে। বাবা-মা বহু পূর্বেই গত হয়েছেন। দুই ভাই ছিল। কোথায় ছিটকে পড়েছে পারুল মিত্রের তা জানা নেই।

এই কাজে কত বেতন পান ?

—বেতন বলে কিছু তো নেই। কনটাক্ট (কনট্রাক্ট) কাজ।

—মাসে কত হয় ?

—৩৫ টাকা, বড় জোর চল্লিশ টাকা।

দুজনের তাতে চলে ?

হাসি দেখা দেয় পারুল মিত্রের মুখে।

চলে ?

—না চলে না—একজনদের বাড়িতে মায়ে ঝিয়ে কাজ করে দিয়ে কিছু পাই। কখনো টাকা, কখনো খাবার।

বাকীটা ? চালের দামই তো চল্লিশ টাকার বেশি।

—ওটা আমাদের কোনো সমস্যাই নয়। ভাতই খেতে হবে এমন বিলাসিতা আমরা অনেক কাল বর্জন করেছি।

—কী খেয়ে থাকেন তাহলে ?

প্রথমে একটু সংকোচ ছিল। তারপরে শুনলাম—ডাল আর সব্জি সেদ্ধ করে খাই। রুটি খাই। ছাতুও খাই।

ঘুরিয়ে অন্য প্রশ্নে যেতে হয়। এইরকম কাজে এলেন কেন ?

—কী করব! লেখাপড়া তো শিখিনি। দোরে দোরে ভিক্ষে করব নাকি? আর এই শহরে মান ইজ্জৎ নিয়ে বেঁচে থাকা যে কী কঠিন তা আপনারা বুঝতেও পারবেন না।

স্বামীকে ফিরে পাবার আশা পারুল মিত্রের নেই। এখন একমাত্র সাধ মেয়েটাকে মানুষ করা। একটু লেখাপড়া শেখানো। ওর জীবনটাও যেন পারুল মিত্রের মতো না হয়।

না কারও সাহায্য তিনি চান না। সাহায্য নেবার দায় অনেক। তাতে সম্মান বজায় থাকে না। এ তাঁর এক মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা।

এমনি পারুল মিত্ররাও শহর কলকাতায় ভিড় করে আছে। তারা থাকে লোকচক্ষুর অগোচরে। ক্বচিৎ কদাচিত যখন তারা চোখে পড়ে তখন দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়।

এমনি আর এক রকমের মেহনতী মেয়ে আছে। তাদের কথাও লোকে

খুব বেশি জানে না। এদের দেখতে পাওয়া যাবে কলকাতার কিছু কিছু ছাপাখানায়।

মেয়ে কম্পোজিটার দিয়ে কাজ করালে প্রেস মালিকের অনেক সুবিধা। এরা মাস মাইনেতে কাজ করে না। কাজ করে কন্ট্রাক্ট-মাফিক। লেখার কপি ভালো থাকলে এদের কাজ হয় নিখুঁত। আর পুরুষ কম্পোজিটার নিতে গেলে সারা দিন ভর কাজের কন্ট্রাক্ট করে নিতে হয়। তাতে আড়াই টাকা তিন টাকা খরচ। মেয়েদের বেলা সে অসুবিধে নেই। তারা অনেক কম পয়সায় নির্দিষ্ট সময়ের কন্ট্রাক্ট নিয়ে কাজ করে।

প্রেসের মালিক হয়তো দেখলেন, একখানা বই-এর তিনটি পৃষ্ঠা কম্পোজ হতে বাকী আছে। পুরুষ কম্পোজিটার নিলে সারা দিনের খরচ দিতে হবে, অথচ কাজটা সারা দিনের নয়। এই অবস্থায় মেয়েদের ডাক পড়ে।

আর তাদের কাজের ধারাটাও অদ্ভুত। মানিকতলার এক বস্তিতে মাসে চার টাকা ঘর ভাড়া দিয়ে বাস করেন মঙ্গলা। প্রৌঢ়া। নিজের কথা নিজে কেউ বলে না। তবু লোক-পরম্পরায় জানা যায়, যৌবনকালে মঙ্গলা একটু প্রজাপতি-স্বভাবা ছিলেন। তার জন্য তাঁকে কম ঠকতে হয় নি। তাই তাঁর জীবনের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা গভীর।

মঙ্গলার একটি দল আছে। মেয়ে কম্পোজিটারের দল। কাজের খবর তাঁর কাছেই আসে। কিন্তু মঙ্গলা কখনো একলা কাজে যান না। তিন পৃষ্ঠা কাজের খোঁজ পেয়ে তিনি দলের দুটি মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে চলে যান। তারপর তিনজনে কাজ করে আসবার সময় তিন ছয় আঠারো আনা নিয়ে চলে আসে।

মঙ্গলার আর একটা কাজ আছে। নিজে জীবনে অনেক দেখে এবং ঠেকে শিখেছেন। তাঁর জানা আছে, এই মস্ত শহরটায় নারী-মাংস-লোলুপ শিকারীর অভাব নেই। সেই সব বিপদ থেকে কচি কাঁচা নরম-সরম গরীব মেয়েগুলিকে রক্ষা করা তাঁর একটা মস্ত বড় কাজ।

অহঙ্কারের অভ্রংলিহ অট্টালিকায় ঘেরা এই শহর কলকাতার কতজন লোক এদের খবর রাখে!

আরো একটি আশ্চর্য মেয়েকে দেখেছি রাজাবাজারের বস্তিতে। তারও কোনো নাম নেই। পরিচয়: রহিম শেখের বউ।

রহিম শেখ কাচ কলে কাজ করত। লম্বা নলের মধ্যে আপ্রাণ শক্তিতে ফুঁ লাগিয়ে বড় বড় কাচের পাত্র তৈরি করা ছিল তার কাজ। ইংরেজীতে বলে গ্লাস ব্লোইং। এ কাজে ভয়ানক পরিশ্রম। বুক একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে যায়। এই কাজ করতে হলে শ্রমিকদের দুধ, ফল এবং নানা পুষ্টিকর খাদ্য দিতে হয়। রহিমের মালিক রহিমকে তা দেয় নি। আর তাই সে যক্ষ্মায় ভুগছে। একটা রিলিফ প্রতিষ্ঠান থেকে ঔষধ পাওয়া যায়। কিন্তু পথ্য কোথায় পাওয়া যাবে! খেটে পয়সা রোজগার করার ক্ষমতা আর রহিম শেখের নেই।

রোজগারের ভার এখন তাই বউ-এর ওপর। অবলম্বনটা অভিনব। বিড়ি বানানো। প্রথম প্রথম অসুবিধে হত। এখন রপ্ত হয়ে গেছে। এক হাজার বিড়ি বানাতে পারলে তিন টাকা পাওয়া যায়। কিন্তু সারাদিনে রহিম শেখের বউ তা পারে না। পাঁচ শ'র বেশি তার হয় না। সেই মজুরীর ওপর দুটো লোকের খাওয়া-পরা। রোগীর চিকিৎসা। হিমসিম খেয়ে যেতে হয়। কিন্তু আশ্চর্য এই রহিমের বউ মাথা খারাপ করে নি।

রহিমের বউ রহিমকে শেখাচ্ছে। বিড়ি বানাতে আর ঠোঙা তৈরি করতে। এতে তার নিজের বানানো বিড়ির পরিমাণ কম হচ্ছে। কিন্তু রহিম শিখে নিতে পারলে সংসারের আয় অনেক বেড়ে যাবে। এই রহিম শেখের বউ-এর ভরসা।

মুখে তার হাসি আছে। মনে ইজ্জৎবোধ। বুকে সাহস।

এমন মেয়েও আছে এই কলকাতায়। ইট কাঠের স্তূপের আড়ালে। ধন ঐশ্বর্য যেখানে পুঞ্জীভূত নয়, সেইখানে।

মিছিলের শহর কলকাতায় এ এক আশ্চর্য মিছিল। মেহনতের, মর্যাদার, জীবনের। হয়তো এরা কোনোদিন নিশান নিয়ে ইনকিলাব বলে রাজপথে এসে সারি বাঁধে নি। কিন্তু মানুষের জীবনের অখণ্ড মিছিলে এরা শরিক। সে মিছিল চলেছে মৃত্যুর বিরুদ্ধে আত্মবিক্রয়ের প্রতিরোধে। চলেছে জীবনবোধের প্রেরণায়।

রাজপথের মিছিল কি আপন সারিতে এদের ঠাঁই দেবে না? কবে দেবে?

প্রফুল্ল রায়চৌধুরী

ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের অবদান

মহাকাশচারী গাগারিন, তিতোফ, নিকলায়েভ, পপোভিচ, বিকোভস্কি, ভ্যালেন্টিনা তেরেসকোভা, শেফার্ড, গ্লেন, কার্পেন্টার ও গর্ডন কুপার,—এঁদের কৃতিত্বে বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়ের সংযোজনা সম্ভব হয়েছে। সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীরা এই বৈপ্লবিক সংযোজনাকে স্বাগত জানিয়েছেন।

দুনিয়ার সাধারণ মানুষের মধ্যেও মহাকাশ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে জানবার অপরিসীম অনুসন্ধিৎসা দেখা দিয়েছে। এই মহাকাশ বিজ্ঞানেই 'আয়নোস্ফিয়ার' (Donophere)-এর গবেষণা একটা বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে। তাই—'আয়নোস্ফিয়ার' সম্বন্ধেও মানুষের কৌতূহল থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

'আয়নোস্ফিয়ার'-এর প্রকৃতি কি, তার বিভিন্ন স্তরগুলির মধ্যে কোনটা কত উঁচুতে, ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে স্তরগুলির উচ্চতার কি রকম হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, স্তরের উৎপত্তির কারণ কি—এ সম্বন্ধে বিশেষ করে বিলাতের রয়েল সোসাইটির ফেলো ও সম্প্রতি লোকান্তরিত জাতীয় অধ্যাপক বিজ্ঞানী ডঃ শিশিরকুমার মিত্রের গবেষণা 'আয়নোস্ফিয়ার' সম্পর্কিত গবেষণার নতুন একটা দিকে পথ নির্দেশ করেছে।

ভূ-পৃষ্ঠের উপরে পঁয়ত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ মাইল পর্যন্ত উচ্চতা বাদ দিয়ে তার উর্ধ্ববর্তী বায়ুমণ্ডলের মধ্যে কয়েকশত মাইলব্যাপী আয়নোস্ফিয়ার বা আয়নমণ্ডল (আয়নায়িত বায়বীয় স্তর) পরিব্যাপ্ত। উত্তর ও দক্ষিণ মেরুপ্রভা, চুম্বক-ঝটিকা, বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলন প্রভৃতি ঘটনাবলীর উদ্ভবও এই আয়নমণ্ডলে।

আয়নমণ্ডল চারটি বায়বীয় স্তরে স্তরীভূত। বিজ্ঞানীরা চারটি স্তরের-ই সন্ধান পেয়েছেন। D, E, F_1 ও F_2 নামে এই স্তরগুলি বিজ্ঞানে পরিচিতি লাভ করেছে।

আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুৎপরিবাহী। এখন প্রশ্ন হচ্ছে—এই অঞ্চলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী কেন?

১৯৭০]

উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলিতে ছিটকে বেরিয়ে আসা 'ইলেকট্রন' এবং একই সঙ্গে ধন-তড়িৎ আর ঋন-তড়িৎ বিশিষ্ট 'আয়ন' (তড়িতাবিষ্ট অনু বা পরমাণু-কে বলা হয় 'আয়ন') রয়েছে বলেই আয়নমণ্ডলের বাতাস বিদ্যুৎ-পরিবাহী, তাই, স্তরগুলি বিদ্যুৎ-পরিবাহকরূপে কাজ করে। তড়িৎ-নিরপেক্ষ অনু বা পরমাণু থেকে 'ইলেকট্রন' বেরিয়ে আসার পদ্ধতিকে বিজ্ঞানে 'আয়নক্রিয়া' (Ionisation) বলা হয়। সূর্যের বিকিরণক্রিয়ার (Radiation) ফলেই 'ইলেক্‌ট্রন' অনু বা পরমাণুর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও ছিটকে বেরিয়ে আসে। আয়নমণ্ডলের স্তরগুলির উপর যখনই সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (Ultra-violet ray) পড়ে, তখনই 'রেডিয়েশন' সম্ভব হয়।

আয়নমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহক স্তরগুলি কি ধরনের কাজ করে?

এই স্তরগুলি, বেতার-তরঙ্গগুচ্ছকে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। বেতার তরঙ্গগুলিই দেশ-বিদেশের বার্তা রেডিও সেটের মাধ্যমে আমাদের কাছে বহন করে নিয়ে আসে। তাহলে বেতার-তরঙ্গগুলি এক জায়গা থেকে দূর-দূরান্তে কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে?

বেতারের মূল তথ্যের আবিষ্কারক মহাবিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল বিদ্যুৎ ও চুম্বক বল-ক্ষেত্রের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের আলোচনা করতে গিয়ে 'তড়িৎ-চুম্বকীয় ঢেউ' (Electro-magnetic wave) আবিষ্কার করেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, এই গতিবেগ, আলো ও তাপ-বিকিরণের গতিবেগের সমান—প্রতি সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। ১৮৮৭ সালে জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ (Hertz) এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন ও বৈদ্যুতিক যন্ত্রের সাহায্যে 'ম্যাক্সওয়েলের ঢেউ'—যা এখন বেতার-তরঙ্গ নামে সুপরিচিত, ল্যাবরেটরিতে সৃষ্টি করতে সক্ষম হন। হের্ৎজের (Hertz) তরঙ্গের দৈর্ঘ্য (wave length) ছিল কয়েক গজ কিন্তু কলকাতায় ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু তাঁর তৈরি যন্ত্র থেকে যে বেতার-তরঙ্গের সৃষ্টি করেছিলেন, তার দৈর্ঘ্য ছিল খুব-ই ছোট, এক ইঞ্চির ছয় ভাগের এক ভাগ মাত্র। আচার্য বসুই বিজ্ঞানী হের্ৎজের বৈদ্যুতিক যন্ত্রের উন্নতিসাধন করেন।

হের্ৎজের বেতার-তরঙ্গ পৃথিবীর কুব্জ-পৃষ্ঠ অনুসরণ করে বিভিন্ন দেশে পৌঁছতে পারে কিনা, এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে সংশয় দেখা দিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা তার সমাধান পেয়েছেন।

১৯০২ সালে বিজ্ঞানী কেনেলি ও হেভিসাইড় যে তথ্য পরিবেশন করেন, তা থেকেই প্রথম জানা গেল, আয়ন মণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহক স্তরগুলিই বেতার-তরঙ্গকে প্রতিফলিত করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়ে দেয়। ১৯২৪ সালে বৃটিশ বিজ্ঞানী অ্যাপলটন্ও ক্ষণস্থায়ী একগুচ্ছ তরঙ্গ পাঠিয়ে দেখলেন 'হেভিসাইড-স্তর'-এ (বিজ্ঞানী হেভিসাইডের নামানুসারে) তরঙ্গগুলি প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো। এজন্য স্তরগুলিকে প্রতিফলক স্তর নামেও অভিহিত করা হয়।

প্রতি সেকেণ্ডে বেতার-তরঙ্গমালা ১,৮৬,০০০ মাইল অর্থাৎ ৩,০০,০০০ কিলোমিটার দূরত্বে ছড়িয়ে পড়ে। মহাবিজ্ঞানী ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েলের হিসাব অনুযায়ীই এই সিদ্ধান্তে পৌছনো গেছে। ৩,০০,০০০ কিলোমিটারকে তরঙ্গ সংখ্যা (Frequency) দিয়ে ভাগ করলে তরঙ্গের দৈর্ঘ্যের (wave length) মাপটা পাওয়া যায়। কিন্তু সবকয়টি বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের হয় না, যেমন—জার্মান বিজ্ঞানী হের্ৎজ কর্তৃক সৃষ্টি বেতার-তরঙ্গ ও ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর সৃষ্ট বেতার-তরঙ্গ একই দৈর্ঘ্যের নয়। দূরপাল্লার যোগাযোগে হ্রস্ব-তরঙ্গের কার্যকারিতা অনেক বেশী।

আয়নমণ্ডলের স্তরে যখন বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে এলো, তখন প্রশ্ন উঠল, এই 'হেভিসাইড-স্তর' ভূ-পৃষ্ঠের কত উঁচুতে? অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বিজ্ঞানীরা অবশেষে দুটো স্তরের সন্ধান পেলেন। একটি প্রায় নব্বুই কিলোমিটার, আর একটি প্রায় দুশো কিলোমিটার উঁচুতে। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী এই স্তর দুটোকে E ও F_1 নামে চিহ্নিত করা হয়েছে।

"এই দুটো স্তর আবিষ্কৃত হওয়ার পরও বিজ্ঞানী অ্যাপলটন আরও গবেষণা চালিয়ে গেলেন। গবেষণালব্ধ বিভিন্ন তথ্য বিশ্লেষণ করে তাঁর সন্দেহ হল E স্তরের নীচে (ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ষাট কিলোমিটার উঁচুতে) হয়তো আর একটি স্তর আছে। কিন্তু অ্যাপলটন এই স্তরের অস্তিত্বের কোনো পরীক্ষামূলক প্রমাণ দিতে পারলেন না। অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীরাও এই স্তরের কোনো প্রমাণ পেলেন না।

১৯৩৫ সালে অধ্যাপক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ও তাঁর সহকর্মীরা ভূ-পৃষ্ঠের পঞ্চান্ন কিলোমিটার উর্ধ্বে আয়নমণ্ডলের একটি স্তরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেয়ে যান (অ্যাপলটন এই স্তরেরই অস্তিত্ব আছে বলে সন্দেহ করেছিলেন) ও সঙ্গে সঙ্গে এই স্তরে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেন। অ্যাপলটন

D-স্তর নামে এর নামাকরণ করেছেন। ডঃ মিত্রের সহকারী ডঃ হৃষীকেশ রক্ষিতও প্রতিফলক স্তর নিয়ে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। D-স্তরটির অস্তিত্ব শুধু দিনের বেলাতেই থাকে।

অধ্যাপক মিত্র ও তাঁর ছাত্র ডঃ যতীন্দ্রনাথ ভড় (বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেডিও ফিজিক্সের প্রধান অধ্যাপক) ১৯৩৮ সালে পৃথিবীর চল্লিশ কিলোমিটার উঁচুতে আরও একটি বিদ্যুত-প্রতিফলক স্তর আবিষ্কার করেন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমেরিকার পশ্চিম ভার্জিনিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কলওয়েলও এই স্তরের সন্ধান পেয়েছেন বলে দাবি করেন ও বিলাতের বিখ্যাত সায়েন্স জার্নাল 'নেচার'-এ এ-সম্বন্ধে একটি বিবরণী প্রকাশ করেন। অধ্যাপক কলওয়েল তখন জানতেন না—অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় অনেকদিন আগেই এই স্তরটিও আবিষ্কার করে সারা দুনিয়ার বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করেছিলেন।

এই আবিষ্কারের পর প্রায় পঁচিশ বছর চলে গেছে। আজও এই নতুন প্রতিফলক-স্তর সম্পর্কে আর কোনো তথ্য হাজির হয়নি। ডঃ মিত্রের ধারণা ছিল, যে-বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন পাওয়া গিয়েছিল, তা সম্ভবত কোনও চলমান এরোপ্লেন থেকে, রেডার প্রতিফলন জাতীয়। অবশ্য তখনও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হয় নি। অধ্যাপক মিত্র ও অধ্যাপক ভড় যে প্রতিফলন-সূত্রে বেতার-তরঙ্গের প্রতিফলন লক্ষ্য করেছিলেন, একই প্রতিফলন-সূত্র অনুসরণ করে ব্যাপকভাবে গবেষণা চালিয়ে ইংলণ্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব-মুহূর্তে রেডার যন্ত্র তৈরি করা হয়।

অধ্যাপক মিত্রের বিখ্যাত বই 'দি আপার অ্যাটমস্ফিয়ার' বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণায় আর একটি বিরাট অবদান। এই বইয়ে উচ্চতর বায়ুমণ্ডলের যে সব তথ্য আলোচিত হয়েছে, সবই কৃত্রিম উপগ্রহ ডিজাইনের সময় অনেক কাজে লেগেছে। এজন্যই সোভিয়েত দেশ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বইটির এত চাহিদা। বইটি ১৯৪৭ সালে আত্মপ্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মার্কিন মুলুকে হাজার হাজার কপি বিক্রী হয়ে যায়। ১৯৫২ সালে এটি রুশ ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও অনুবাদ করার প্রচেষ্টা চালানো হচ্ছে।" (লেখকের একটি প্রবন্ধ থেকে উদ্ধৃত)

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে রেডিও-টেলিফোনির আবিষ্কারকে কেন্দ্র করে আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জগতে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছিল। রেডিও-

টেলিফোনির আবিষ্কারের মূলে ছিল এক বিশেষ ধরনের ভালভ্ (valve) আজকাল রেডিও সেটে এই ভালভ্-কে কাজে লাগানো হয়েছে। এই ভাল্‌ভের জন্যই আজ পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের মানুষের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়েছে। যে বেতার-তরঙ্গ ছিল অত্যন্ত মৃদু, ধরা যেত না, ভাল্‌ভ তাকে অবশেষে শ্রুতিগোচর করিয়েছিল। অধ্যাপক মিত্রও এই ভাল্‌ভের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং বেতার-বিষয়ে তৎকালীন বিখ্যাত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক গ্যিতঁর-এর ল্যাবরেটরিতে ভাল্‌ভ সম্বন্ধে কাজ আরম্ভ করেছিলেন। এখানেই তাঁর বেতার-গবেষণার প্রথম হাতে খড়ি হয়।

আয়নমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহী স্তরগুলিকে অতিক্রম করেই আজ মহাকাশচারীদের মহাকাশে যেতে হচ্ছে। তাই—কোন্ স্তরের কি প্রকৃতি, এ-সম্বন্ধে বিজ্ঞানী ডঃ মিত্রের গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে মহাকাশ বিজ্ঞানীদের যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য নিতে হচ্ছে।

জ্যোতির্ময় গুপ্ত

পুস্তক-পরিচয়

People and Politics in Early Medieval India. (1206—1394 A. D.) Asit Kumar Sen. Indian Book Distributing Company. Cal.-9.

ভারতবর্ষের মধ্যযুগীয় ইতিহাস আলোচনার ক্ষেত্রে একটি পুরাতন ধারণা এখনও আমাদের ইতিহাস চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ধারণাটি হল এই যে আমাদের দেশের অর্থনৈতিক, রাষ্ট্রনৈতিক বা সামাজিক ঘটনাগুলিতে, কিম্বা নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণে—দেশের জনসাধারণের কোনো ভূমিকাই ছিল না। আধুনিক ইতিহাসের সূচনা পর্যন্ত ভারতের সাধারণ মানুষ—নিরীহ মূক পুতুলের মতো রাজার অনুজ্ঞা আর স্বেচ্ছাচারী শাসনের মুখাপেক্ষী ছিল। ভারতে মধ্যযুগীয় মুসলমানী শাসন সম্পর্কে এই ধারণা যে বার বার প্রযোজ্য হয়েছে তাই নয়, অনেক বেদনাদায়ক ভ্রান্ত সিদ্ধান্তেরও সৃষ্টি করেছে। স্যার এচ. এম. ইলিয়ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থের (Biographical Index to the Historians of Muhammadan India) ভূমিকায় উপরোক্ত মতের অনুসরণে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন : "For history will show them (Indians) that certain peculiarities of physical or moral organisation···have hitherto prevented their even attempting national independance —which will continue to exist to them but as a name." ইলিয়ট সাহেবের সিদ্ধান্ত আজ মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্তের যুক্তি ও বিশ্লেষণ আজও আমাদের দেশের ঐতিহাসিকের পেছনে ছায়ার মতো চলেছে। খ্যাত পণ্ডিত জি. এইচ. স্যাবাইন কিছুদিন আগেও এমন মন্তব্য করেছেন যা আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের যুক্তি ও তথ্য দ্বারা অস্বীকৃত হয় নি। "The oriental monarchy is more truely a form of tyranny, though it is lawful after a barbarian fashion, since Asiatics are slaves by nature and do not object to despotic government." (A History of Political Theory, G. H. Sabine.) আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবীরা সব সময়েই এই ধরনের মতামতের বিরোধিতা করতে চেয়েছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে বহুল প্রচলিত এই ধারণার মূলে, ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

নিয়ে কখনও কুঠারাঘাত করা হয় নি। প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মধ্যেও এ ব্যাপারে নেহাতই অকিঞ্চিৎকর উৎসাহ দেখা গেছে।

তথ্যানুসন্ধানী ঐতিহাসিকেরা অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুলতানি আমলের জনসাধারণের দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করেছেন। যে যুগে রাজসভার বিবরণী রচয়িতারা কূটনৈতিক "উচ্চস্তরের" রাজনীতির কথায় ব্যস্ত ছিলেন, সে যুগেও আমীর খসরু বলেছেন যে "রাজার গলার রত্নমালার প্রতিটি রত্ন হল দরিদ্রের বেদনাশ্রু।" আমাদের দেশে মধ্যযুগের ইতিহাস আলোচনার রীতিই হল, তৎকালীন জনসমষ্টিকে কেবল হিন্দু আর মুসলমান এই ভাগে ভাগ করে দেখার চেষ্টা। ইংরাজ ঐতিহাসিক মোরল্যাণ্ড এই চেষ্টার বিরোধিতা করেছিলেন জিয়াউদ্দিন বারণীর বিবরণের নজীর তুলে। "Taking his book as a whole, I would imfer that he thought of the kingdom consisting not of two elements but of three—Moselems, Hindus and 'herd's or peasants." (The Agrarian System of Moselem India. Moreland. Page. 32. F. N.) কিন্তু ভারতীয় বিদ্যাভবনের প্রকাশিত 'The Delhi Sultanate' গ্রন্থের রচয়িতারা মোরল্যাণ্ডের এই সাধারণ বক্তব্যটিকেও সহ্য করতে না পেরে বাতিল করে দিয়েছেন। "Moreland adds…but this interpretation is atleast doubtful." (The Delhi Sultanate, Page 24. Bharatiya Vidya Vaban.) ঐতিহাসিক কে. এম. আশরফ সুলতানি আমলে কৃষক ও নগরাঞ্চলের সাধারণ মানুষ সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য বিস্তারিতভাবে উপস্থাপিত করেছেন (Life and conditions of the People of Hïndustan. K. M. Ashraf. Jiwan Prakasan)। জাঠ ও সতনামী বিদ্রোহ প্রসঙ্গে ডব্লু. সি. স্মিথ মুসলমানি কেন্দ্রীয় শাসনের বিরুদ্ধে উপজাতি বিক্ষোভের প্রচুর তথ্য জানতে পেরেছিলেন। এত প্রচুর তথ্য থাকা সত্ত্বেও, ভারতের ইতিহাসে এ সম্পর্কে যথেষ্ট আলোচনা হয় নি দেখে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। (Lower Class Uprisings in the Moghul Period." W. C. Smith. Islamic culture. Vol. xx. 1946.)

মধ্যযুগের ভারত যে সুলতানি একনায়কত্বের অধীন ছিল এ সম্পর্কে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তৎকালীন ঐতিহাসিক বিবরণীর রচয়িতারা প্রায় সকলেই সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিলেন

এবং কেবল রাজসভা সংক্রান্ত কূটনীতি ও রাজকীয় ঘটনাবলীতেই উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু তবু এমন অনেক তথ্য পাওয়া যায়—যার ভিত্তিতে প্রমাণ করা সম্ভব যে সুলতানি আমলে সাধারণ মানুষ কোনক্রমেই দেশের শাসননীতি, শাসনপদ্ধতি ও রাজনীতি সম্পর্কে নির্বিকার, নিষ্ক্রিয় ছিল না। বলাই বাহুল্য যে প্রগতিশীল ব্যক্তিমাত্রেই এই মতটি বিশ্বাস করতে চেয়েছেন! কিন্তু এ যাবৎ তথ্যাদির অভাবের জন্য সেই মত প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। অমিতকুমার সেন এই দুরূহ কাজটি তাঁর গ্রন্থে সাফল্যের সঙ্গে সম্পাদন করেছেন।

সুলতানি একনায়কত্বের যুগে, মাত্রাতিরিক্ত স্বেচ্ছাচারিতা সীমাবদ্ধ করার জন্য মূলত তিনটি বিরোধী-শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম বিরোধী শক্তি ছিল একটি আইনগত ঘটনা। হিন্দুস্থানের সুলতান ইসলামজগৎ-প্রধান খলিফার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করতেন। কিন্তু এই লৌকিক সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি অধিকাংশ সময়ে হিন্দুস্থানের সুলতানের ক্ষমতা বা যথেচ্ছাচারিত খর্ব করতে পারে নি। স্বেচ্ছাচারিতার দ্বিতীয় বাধা ছিল ইসলামি আইনের বিধিনিষেধ। কিন্তু সুলতানি আমলের ভারতে এই সব বিধিনিষেধ প্রায়শই অমান্য করা হয়েছে এমন তথ্য বিরল নয়। তৃতীয় বাধা ছিল তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থার বৃহত্তম শক্তি—অভিজাত সম্প্রদায়। কিন্তু মধ্যযুগের ইতিহাসে বারম্বার দেখা গেছে যে শক্তিশালী সুলতানের কাছে আত্মসমর্পণ করে অভিজাতরা হয় যথেচ্ছাচারিতার পথ সহজ করেছেন, অথবা দুর্বল সুলতানের শক্তিহীনতার সুযোগে দেশে অরাজকতার সৃষ্টি করেছেন। প্রসঙ্গত অভিজাতদের মধ্যে ভারতীয় ও তুরস্কদেশীয় দলাদলি, জাতিবৈষম্য ও সংঘর্ষের কথা উল্লেখযোগ্য।

অমিতকুমার সেন তাঁর গ্রন্থে উপরোক্ত বাধাগুলির বিফলতা আলোচনা করে এক স্বতন্ত্র বিষয়ে এসে পড়েছেন। মধ্যযুগে সাধারণ মানুষের চেতনা নিঃসন্দেহে নিম্নস্তরের ছিল। কিন্তু তবু জনগণের বাধাদান ও রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টির ফলে সুলতানের যথেচ্ছাচারিতা ও সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনা প্রবাহ যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবিত হয়েছিল। অর্থাৎ বিক্ষিপ্তভাবে হলেও, দেশের জনসাধারণ কোনো কোনো সময়ে নিজেদের ভাগ্যনিয়ন্ত্রণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সুলতানী যথেচ্ছাচারিতাকে সংযত করেছিল। অন্য দিকে আবার মধ্যযুগের অনেক সুলতানই তাঁদের শাসন অব্যাহত রাখার জন্য

সাধারণ মানুষের বিশ্বস্ত সমর্থনের কথা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেছিলেন। সেই সমর্থন অর্জনের ক্ষেত্রে শাসননীতির কিছু কিছু রদবদলও সম্ভবত ঘটেছিল। অসিতকুমার সেন ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে এই ঘটনাগুলি কি ভাবে সংঘটিত হয়েছিল—তা দেখাতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বক্তব্যের সমর্থনে যুক্তি ও তথ্যাবলী কয়েকটি প্রধান ধারায় বিভক্ত হয়ে বিস্তৃত হয়েছে। যেমন আলোচিত হয়েছে সুলতানি আমলে নগরাঞ্চলের জনগণের কার্যকলাপ, গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের রাজনৈতিক প্রভাব, উপজাতিগুলির বিরুদ্ধতা ইত্যাদি। নগরাঞ্চলের জনগণের বিবরণে দিল্লী নগরী তার অবস্থিতি ও ঐতিহ্যের জন্য এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। নগরীর শোষিত জনসাধারণ ও অভিজাতকুলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যের তথ্যবহুল বর্ণনা খুব দুষ্প্রাপ্য নয়। এই শোষিত জনসাধারণ অবশ্যই যে দুর্বল জড়ত্বের ভূমিকা পালন করে নি তার প্রমাণ আছে। ইলবারী বংশ থেকে তমলুক বংশের রাজত্বকালের মধ্যে, অসংখ্যবার দিল্লী নগরীর এক সক্রিয় মেজাজের পরিচয় পাওয়া যায়। সুলতানা রিজিয়ার ক্ষমতাপ্রাপ্তি ও রাজ্য পরিচালনায় দিল্লীবাসীর সহায়তা, বলবনের শাসনরীতির পরিবর্তনে দিল্লীবাসীর অসন্তোষের প্রভাব, সুলতান হওয়ার পরও জালালুদ্দিনের দিল্লী প্রবেশে অসামর্থ্য, —দিল্লীর জনগণের সংগ্রামের সাক্ষ্যই বহন করে। কোতোয়ালি অত্যাচারের বিরুদ্ধে হাজী মৌলার বিদ্রোহ যে আলাউদ্দিনের শাসনতান্ত্রিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারকার্যকে প্রভাবিত করেছিল—একথা মনে করার সঙ্গত কারণ আছে। মহম্মদ বিন তুঘলক দিল্লী থেকে দৌলতাবাদে রাজধানী পরিবর্তনকালে, শাসনতান্ত্রিক সুবিধা অপেক্ষা দিল্লীবাসীর অসন্তোষের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার কথাই বিশেষভাবে চিন্তা করেছিলেন, এমন মনে করারও যথেষ্ট যুক্তি আছে। জনমতের চাপে ফিরোজ তুঘলককেও একাধিকবার শাসননীতির পরিবর্তন সাধন করতে হয়েছিল। ব্রাহ্মণদের ওপর জিজিয়া কর হ্রাস না করে উপায় ছিল না। ফিরোজশাহী দাসেদের নেতৃত্বে সংগঠিত জনতার বিক্ষোভ রাজকুমার মহম্মদ খাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।

সুলতানি শাসনকালে দিল্লীর মতো আরও অনেক নগরীর কাহিনীতেই সক্রিয় জনমতের পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় লাহোর ও মুলতানের ঘটনাবলী, দক্ষিণের কাম্পিলি ও পূর্বাঞ্চলের "বিদ্রোহের নগরী" লক্ষণাবতীর ইতিহাস।

শহরাঞ্চলের সাধারণ মানুষের সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি, সুলতানী আমলে গ্রামাঞ্চলের জনগণের সক্রিয়তাও লক্ষণীয়। শহরের শোষিত জনসাধারণ (urban poor বা city-plebians) ও গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণী (প্রধানত হিন্দু ধর্মাবলম্বী) সুলতানি রাজনীতিতে প্রায় একই ভূমিকা পালন করেছে। সুলতানি আমলে ভারতের পুরাতন গ্রাম্য গোষ্ঠী ও গ্রামীন গণতন্ত্র শুধু যে অবিকৃত ছিল তাই নয়, সেগুলি মুসলমান ক্ষমতাকেও অনেক পরিমাণে সংযত রেখেছিল। জনসংখ্যার চেয়ে ভূমি বেশি থাকার ফলে, সুলতান ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অতিরিক্ত কর বসানোর বিশেষ সুবিধা ছিল না। এ ছাড়া তৎকালীন কৃষক বিদ্রোহ ও আর গণভাবনা, সুলতানি করনীতির ওপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভূমির রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে বলবন যে "মধ্যপন্থার" কথা ঘোষণা করতেন, তা সম্ভবত তাঁর মানসিক ঔদার্যেরই লক্ষণমাত্র নয়। দোয়া অঞ্চলে, মহম্মদ বিন তুঘলকের করবৃদ্ধির ফলে কৃষকবিদ্রোহ ক্রমশ এক প্রবল গৃহযুদ্ধের আকার ধারণ করেছিল।

সুলতানি আমলে দুর্ধর্ষ উপজাতিগুলির উল্লেখ না করলে, সাধারণ মানুষ ও তৎকালীন রাজনীতির কথা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। এসম্পর্কে, বিশেষ করে খোখর, গাক্কর, জাঠ, গুজ্জার, মেওয়াটি, ভীল ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের লোকেদের বিক্ষোভ ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচরণ সম্বন্ধে—তথ্যের প্রাচুর্য আছে। সুতরাং সমস্ত দেশ জুড়ে সুলতানি স্বেচ্ছাচারী শাসন যে নিষ্কণ্টক ও অব্যাহত ছিল—একথা আদৌ সত্য নয়।

অসিতকুমার সেনের গ্রন্থে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে। যেমন, (১) গ্রন্থকার মনে করেন যে সুলতানি শাসকের হিন্দুবিরোধী নীতি প্রধানত ধনী ও শক্তিশালী হিন্দুদের বিরুদ্ধেই প্রয়োগ করা হয়েছিল, সাধারণ হিন্দু বা হিন্দু কৃষকের বিরুদ্ধে নয়। শাসকগোষ্ঠীর কাছে শাসিত শ্রেণীর ধর্মের বাছবিচার না থাকাই সম্ভব, যদিও সুলতানি আমলে ধর্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বদাই এক অমোঘ হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গ্রন্থকারের বক্তব্যের গুরুত্ব হল এই যে সুলতানি আমলে মধ্যযুগীয় ধর্মবিদ্বেষ থাকা সত্ত্বেও, সম্ভবত কোনো সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা বা বিরোধে সাধারণ মানুষ অংশগ্রহণ করে নি। (২) দিল্লী শহরের বিবরণ ও জীবনযাত্রার কথা গ্রন্থের আর এক আকর্ষণীয় বিষয়। দিল্লীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য সম্পর্কে, এই গ্রন্থে অনেক তথ্যের সমাবেশ রয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য

তথ্য হল-সাধারণ মানুষের আয়ের হিসাব ও তার বিশ্লেষণ। (২৩ পৃঃ) (৩) সুলতানি আমলে, ভারতবর্ষীয় অভিজাত ও তুর্কী অভিজাতদের বিরোধের একটি নিখুঁত ধারাবাহিক বিবরণ এই গ্রন্থে রয়েছে। ঘটনাটি মধ্যযুগের ইতিহাস পাঠকের কাছে আদৌ অপরিচিত নয়। তবু ইতিপূর্বে এই বিরোধের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ, অধ্যাপক সরন, কে. এম. আশরফ ও অন্যান্য কয়েকজনের কিছু বিক্ষিপ্ত আলোচনা ছাড়া বিশেষ চোখে পড়ে নি। গ্রন্থকার অবশ্য তৎকালীন ভারতবর্ষীয় সম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে মনে হয়। কিন্তু ভারতবর্ষীয় মুসলমান ও তুর্কী মুসলমান—এই দুই অভিজাত সম্প্রদায়ের জাতিগত সংঘর্ষে, একটি সম্প্রদায় সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হওয়ার কারণ কি?

সুলতানি আমলের ব্যবসায়ী শ্রেণী সম্পর্কেও পাঠকের কৌতূহল সম্পূর্ণভাবে নিবৃত্ত হয় না। গ্রন্থকার ব্যবসায়ী শ্রেণীকে নাগরিক দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করেছেন, কারণ অন্যান্য সাধারণ মানুষের মতো ব্যবসায়ীরাও সুলতানি শাসনে শোষিত হয়েছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রেই কি ব্যবসায়ীদের মনোভাব ও স্বার্থ সাধারণ মানুষের স্বার্থকে শক্তিশালী করেছিল? আলোচ্য বইটিরই দুটি স্থানে গ্রন্থকার স্বতন্ত্র কথার আভাস দিয়েছেন। বই-এর ৩০ পৃষ্ঠায় ব্যবসায়ীদের কিছু কিছু জনবিরোধী কার্যকলাপের উল্লেখ আছে। প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত করে লাভবান হওয়া, বেশি দাম নেওয়া, ক্রেতাকে প্রতারিত করা ইত্যাদি ব্যবসায়ী অসৎ অভ্যাস অতি সুপরিচিত। বই-এর ৯১ পৃষ্ঠায় গ্রন্থকার আর একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। সুলতান মুইজুদ্দিন বহরাম শার শাসনকালে, লাহোর মোঙ্গলদের দ্বারা আক্রান্ত হলে, সেখানকার ব্যবসায়ীরা প্রতিরোধের প্রচেষ্টায় কোনো উৎসাহ দেখায় নি। এ দুটি ঘটনা ছাড়াও সাধারণভাবে জানা যায় যে আলাউদ্দিনের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগ্রহণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের ফলে সাধারণ মানুষের প্রভূত সুবিধা হলেও, ব্যবসায়ীদের বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হতে হয়েছিল। গ্রন্থে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা সম্পর্কে আর একটু বিস্তারিত আলোচনা থাকলে, বোধহয় সাধারণ পাঠক সন্তুষ্ট হতে পারতেন।

মধ্যযুগের ইতিহাসে সাধারণ মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে অসিতকুমার সেন ধৈর্য ও পরিশ্রম সহকারে মৌলিক গবেষণা করেছেন। এই কাজের জন্য তিনি নিশ্চয়ই সকলের ধন্যবাদের পাত্র। আশা করা যায় যে অদূরে ভবিষ্যতে, মধ্যযুগীয় ইতিহাসের মোগল শাসন সম্বন্ধেও এই জাতীয় আলোচনায় কেউ কেউ অগ্রণী হবেন।

অমিয় দত্ত

Geography of Hunger : by Josue de Castro. Victor Gollanez, London.

বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের ছাতি আর কব্জি সরু সরুই হয়ে থাকে; কিছুকাল ধরে ওজনও কমছে; ওটা জল-হাওয়ার জন্যে। বাঙ্গালী মেয়েদের রক্তে হিমোগ্লোবিন কমই হয়, এবং কুড়িতেই হয় বুড়ি; সে ওরা ঠিকমতো খাওয়া-দাওয়া করে না, আর বছর বছর আঁতুড়ে যায় বলে। বাংলার বাচ্চা-কাচারা বরাত জোরে সে-আঁতুড়-ঘর যদি পেরোতে পারে, তাহলে হাড়-জিরজিরে লিক্‌লিকে ধরনের হবেই। আবহমানকাল ধরে এই তো দেখে আসছি! আর বাঙ্গালী চাষী? যেমন্ চিররুগ্ন তেমনি কুসংস্কারান্ধ; ম্যালেরিয়া গেল তো যক্ষ্মায় ধরল; ফসল ফলাবার মুরোদ নেই, বংশবৃদ্ধিতে ওস্তাদ।

বেশ কয়েক যুগ ধরে বাঙ্গালীর শারীরিক কাঠামোর এ-হেন ছবিখানি দেখে শুনে এমনি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছি আমরা যে লাঠিয়াল বাঙ্গালী, কুস্তিগীর বাঙ্গালী বা ঘোড়সোয়ার বাঙ্গালীর মূর্তি মন থেকে তো বটেই, এমন কি ইতিহাসের পাতা থেকেও প্রায় মুছে যেতে বসেছে। স্বভাবতই লম্বা-চওড়া গাট্টা-গোট্টা মানুষ দেখলে চোখ আপনিই নত হয়ে আসে। রংটা কটা হলে তো কথাই নেই। তা ছাড়া ভবিতব্যে চিরকালই অগাধ বিশ্বাস আমাদের; তাতে চিড় খাওয়ানো কঠিন বইকি।

সুতরাং ব্রেজিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি গবেষণা বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ জে. ডি. কাস্ত্রো তাঁর 'জিয়োগ্রাফি অফ্ হাঙ্গার'-এ যখন ঘোষণা করলেন যে "যে-সব দৈহিক বিশেষত্বকে 'উত্তম' কিংবা 'অধম' জাতির লক্ষণ হিসাবে ব্যক্ত করা হয় আসলে সেগুলি হল খাদ্যের প্রভাব"—থমকে গেলাম। চমক লাগল আরো যখন দেশ বিদেশের খ্যাতিমান বিজ্ঞানীদের সংগৃহীত তথ্য ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে উনি দেখালেন এবং দাবি করলেন যে "এইসব বিশেষত্ব বংশগতির থেকেও ঢের বেশি নির্ভর করে স্থানীয় অধিবাসীরা কি ধরনের খাদ্য খেতে পায় এবং কি রকম তাদের খাদ্যাভ্যাস, তার উপর।" বিস্ময়ের ঘোর আর কাটতে চায় না। শেষ পর্যন্ত অবশ্য কাটল যখন দেখা গেল বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদ থেকে শুরু করে ভারত সরকারের মুদালিয়র কমিশন পর্যন্ত খাস স্বদেশী সংস্থাগুলিও পুষ্টি-সংক্রান্ত আধুনিক তত্ত্বের সন্ধানে শরণাপন্ন হয়েছেন ডা কাস্ত্রোর এই 'জিওগ্রাফি অফ্ হাঙ্গারের'।

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের উত্তর প্রান্তে শেট্‌ল্যাণ্ড দ্বীপ। সেখানে পাওয়া যায়

দুনিয়ার সব থেকে ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া। ঠিক যেন বাচ্ছাদের খেলনা। সবাই জানত, শেট্‌ল্যাণ্ডের টাট্টু একটা বিশিষ্ট জাত। একবার হল কি, একদল ব্যবসায়ী ঠিক করল, এই মজাদার টাট্টু আমেরিকায় চালান দিয়ে সেখানেই বংশবৃদ্ধি করাবে। তাতে খরচ কম পড়বে, মুনাফা হবে বেশি। করলও তাই। কিন্তু অবাক কাণ্ড, আমেরিকায় গিয়ে শেট্‌ল্যাণ্ডের টাট্টু এক এক পুরুষ পরে পরে আকারে ক্রমশ বড় হতে হতে শেষ পর্যন্ত হয়ে গেল অন্য সব ঘোড়ার মতো! আশ্চর্য ব্যাপার! ঘটনাটা কি! অনেক অনুসন্ধান, অনেক গবেষণার পর জানা গেল, আসলে ঐ টাট্টুগুলির পূর্বপুরুষরা শেট্‌ল্যাণ্ডে এসেছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জেরই অন্যান্য জায়গা থেকে। শেট্‌ল্যাণ্ডের মাটিতে তথা ঘাসে কোনো কোনো খনিজ পদার্থের একান্ত অভাব থেকেই সাধারণ আকারের ঘোড়াগুলি কালক্রমে টাট্টুতে পরিণত হয়েছিল। আমেরিকায় গিয়ে স্বাভাবিক খাদ্য পেয়ে তাদের পুনর্জন্ম হল।

ঘোড়া কেন, মানুষের ক্ষেত্রেই বা ব্যতিক্রম কিসে? বিষবরেখার কাছ বরাবর বাস করে আফ্রিকার খুদে মানুষেরা। তাদের প্রধান খাদ্য আরণ্যক ফলমূল। এতদিন ধারণা ছিল, ওরা বুঝি চিরকালই ঐ-রকম— বামন; বিশেষ এক প্রজাতির মানুষ। কিন্তু দেখা গেল, ওদেরই একটি অংশ সমতল ভূমিতে গিয়ে চাষ-আবাদ, পশুপালন শিখে কালক্রমে সাধারণ মানুষের চেহারা পেয়েছে।

গল্প নয়, বিজ্ঞানের কষ্টিপাথরে যাচাই করা এই সব সত্য ঘটনার বিবরণ পাওয়া গেল 'জিয়োগ্রাফি অফ্ হাঙ্গার' থেকে। এবং এ থেকে কাস্ত্রো এই কথাই প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে তথাকথিত "অধম" জাতিগুলি আসলে "বুভুক্ষু" জাতি। সে বুভুক্ষা নিছক দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি নয়; কোথাও ক্যালরির, কোথাও প্রোটিনের, কোথাও ভিটামিন কিংবা খনিজ লবণের অভাব-জনিত ক্ষুধা। সে-ক্ষুধা কখন প্রকট, কভু প্রচ্ছন্ন। পুরুষানুক্রমে দেহগঠনের উপযোগী পুষ্টিকর খাদ্য না পাওয়ার ফলেই তারা হয়েছে শীর্ণ, হ্রস্ব, রুগ্ন, অকালমৃত্যুর সহজ শিকার। এবং বিশেষ করে লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, খাদ্যাভাবের ও অপুষ্টির সঙ্গে অধোগত দৈহিক কাঠামোর নিবিড় সম্পর্কের এই লক্ষণগুলি সব থেকে প্রকট এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকায়। একটার পর একটা দেশ ধরে তাদের অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার মারফৎ পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক মানুষের চির-বুভুক্ষার নিদান বিশ্লেষণ করেছেন কাস্ত্রো অপূর্ব দক্ষতার সঙ্গে।

বুভুক্ষা বহুরূপী। অনাহার ও অর্ধাহারের প্রেতরূপ এই বাংলা দেশেই আমরা দেখেছি পঞ্চাশের মন্বন্তরে। এর আর এক রূপ দেখছি চোখের উপর— শহরে—স্কুল-কলেজে, গৃহস্থের অন্দরমহলে, ক্ষেতে-খামারে, কারখানায়, বস্তিতে। প্রতিদিনের খাদ্যে পুষ্টিকর উপাদানের একান্ত অভাবে একটা সমগ্র জাতির ক্ষয়িষ্ণু রূপ কিছুটা প্রচ্ছন্ন বলেই সে-রূপ আরো মারাত্মক।

সারা দুনিয়ার তাবৎ বিজ্ঞানী মহলের মতে এশিয়া ও আফ্রিকায় অপুষ্টির প্রধান কারন খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির অভাব। কাস্ত্রো বলেছেন, "ভারতীয়দের জৈব-গঠনের গুরুতর ক্ষয় হয়েছে খাদ্যে উচ্চ মানের প্রোটিনের একান্ত অভাব থেকে। এই অভাব এমন পাপচক্রের জন্ম দেয় যার ফলে এসেছে জাতিগত অবনতি ও অবক্ষয়।" শুধু তত্ত্ব নয়, তথ্যগত বিচারেও এই উক্তিটি স্বতঃসিদ্ধ। একজন মেহনতি মানুষের দৈনিক খাদ্যে ক্যালরি প্রয়োজন ৩০০০-৩৩০০; প্রোটিন চাই ৮০-১০০ গ্রাম, এবং তার মধ্যে অর্ধেক হওয়া উচিত আমিষ জাতীয় "সম্পূর্ণ" প্রোটিন। অথচ জাতিসংঘের সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে ভারতবাসীর দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ ২০৮০ (F. A. O. Production Year Book, 1960); আর প্রোটিন পাই আমরা গড়ে দৈনিক ৫২ গ্রাম এবং "সম্পূর্ণ" প্রোটিন (মাছ মাংস ডিম দুধ) মাত্র ৬ গ্রাম। তাও গড়ে—অর্থাৎ বড়লোক গরীবলোক মিলিয়ে। সবথেকে ভয়ের কথা হল এই যে ১৯৩৫-৩৮ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৯ সালে "সম্পূর্ণ" প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ এতটুকুও বাড়েনি, বরং কমেছে (Eastern Economist, Annual Number, 1961)।

তার ফলটা কি? ফল—ব্যাপক স্বাস্থ্যহীনতা, ক্রমবর্ধমান রোগ প্রবণতা, দুরন্ত শিশু-মৃত্যু, নিরবচ্ছিন্ন মহামারী, ক্ষয়ের প্রসার, কর্ম ও মনন শক্তি হ্রাস। এক কথায়, মানুষ হিসাবে একটা 'অধম' জাতির যা কিছু লক্ষণ, সব। কয়েক শতাব্দী পরে বাঙ্গালী জাতটা শেটল্যাণ্ডের টাট্টু বা আফ্রিকার বামনদের পর্যায়ে পৌছবে কিনা কে জানে! তফাৎ যদি কিছু ঘটে তা শুধু এই যে, ওদের দৈহিক অবনতি ঘটেছিল না-জেনে, না-বুঝে; আর আমরা ক্ষয়ের সিঁড়ি বেয়ে তরতরিয়ে নেমে চলেছি সম্পূর্ণ সজ্ঞানে, এবং বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিশ্ব-বিপ্লবের যুগে।

"বুভুক্ষা শুধু দেহটাকে তছনছ করে না, আত্মাকে হেয় করে।…ক্ষুধার তাড়না সামাজিক আচার ব্যবহারে পরিবর্তন আনে, মানসিক কাঠামোকে

প্রভাবান্বিত করে।…ক্ষুৎপীড়িত মানুষকে নিতান্ত অস্বাভাবিক ব্যবহার করতেও দেখা গিয়েছে…ক্ষুধিত পশুর মতোই তখন তার আচরণ।…ডাকাতি, রাহাজানি, বেশ্যাবৃত্তি ইত্যাদি অসামাজিক ক্রিয়া-কলাপের পিছনে কাজ করে তীব্র অথবা দীর্ঘস্থায়ী ক্ষুধার তাড়না।”

“…ক্ষুধা ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে…আত্ম সংযম ও মানসিক স্থৈর্য ক্রমশ কমে আসে, এবং শেষ পর্যন্ত সমস্ত নীতিবোধ ও সংযম যায় হারিয়ে।” এশিয়া আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো জাতির মধ্যে দেখা যায় যে “হতাশা, উদ্যমহীনতা, ভবিতব্যে বা ঐশী শক্তিতে অন্ধ বিশ্বাস, তার উৎপত্তি খাদ্যাভাব থেকে।”

বুভুক্ষার কায়িক ও আত্মিক পরিণতি সম্পর্কে কাস্ত্রোর এই শাণিত বিশ্লেষণ সমাজবিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার বিষয়।

‘জিয়োগ্রাফি অফ হাঙ্গার’ পড়ে পাঠক জানতে পারবেন যে বেশ কিছুকাল আগে ম্যাকে (McCay) এবং ম্যাক্‌ক্যারিসন (McCarrison) নামে দু-জন বিজ্ঞানী ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকা বিশ্লেষণ করে এই এই সিদ্ধান্তে পৌছন যে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজীদের তুলনায় উত্তর পাঞ্জাবের শিখদের স্বাস্থ্য উন্নততর হওয়ার প্রধান কারণ শিখরা প্রোটিন খায় বেশি। ইঁদুরের উপর শিখ ও মাদ্রাজী খাদ্য পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়েছে। ব্রেজিলে কাস্ত্রোর নিজস্ব সমীক্ষা এবং কেনিয়ায় বয়েড ওর ও গিল্কস-এর গবেষণা নিঃসংশয়ে প্রমাণ করেছে যে জনসংখ্যার যে অংশের খাদ্যে প্রোটিনের নিরবচ্ছিন্ন অভাব, তাদের ওজন এবং দৈর্ঘ্য তুলনায় কম।

শুধু এই নয়, প্রোটিনের প্রভাব আরো সুদূরপ্রসারী। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সংক্রামক ব্যাধির ব্যাপকতা নিয়ে বিজ্ঞানী মহলে উদ্বেগের অন্ত নেই। নিদান ও নিরসনের পথ নিয়ে গবেষণা চলছে অনেক কাল। কাস্ত্রোর মতে এই সংক্রমণ-প্রবণতার অন্যতম প্রধান কারণ খাদ্যে মাছ মাংস ডিম দুধ প্রভৃতি দেহ সংরক্ষণকারী উপাদানের অস্বাভাবিক অপ্রতুলতা এবং ত্রুটিপূর্ণ খাদ্যাভ্যাস। এই অভিমত অবশ্য আরও প্রত্যক্ষ প্রমাণসাপেক্ষ। কিন্তু প্রসঙ্গত মনে রাখা দরকার যে খাদ্যে প্রোটিনের স্থায়ী অভাব ঘটলে রোগ প্রতিরোধ শক্তি অবশ্যই ক্ষুণ্ণ হয়, জীববিজ্ঞানে এই সত্যটি বহু পূর্বেই পরীক্ষিত। অধুনা বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংসদের পক্ষ থেকেও ভারত, ইন্দোনেশিয়া, সিংহল প্রভৃতি

দেশে শিশুমৃত্যুর অস্বাভাবিক উচ্চহারের প্রধান কারণ হিসেবে এই তত্ত্বটির উপরই বিশেষ জোর দেওয়া হচ্ছে।

প্রোটিন-ক্ষুধা সম্পর্কে তৃতীয় যে সম্পাদ্যটি কাস্ত্রো উপস্থিত করেছেন তা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক, মানব সমাজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তেমনি গুরুত্বপূর্ণ। স্লোনেকার-এর তত্ত্বকে সমর্থন করে উনিও দাবি করেছেন যে খাদ্যে প্রোটিনের নিরবচ্ছিন্ন অভাব জীবের প্রজনন ক্ষমতাকে উদ্দীপিত করে। স্লোনেকার ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। কাস্ত্রো হাজির করেছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনপ্রতি প্রোটিন গ্রহণের এবং জনসংখ্যার হার বৃদ্ধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ। দেখা গিয়েছে, যে-সব দেশে জন্মহার বেশি, সেখানকার মানুষ প্রোটিন খেতে পায় কম। খুবই কম। এবং এক্ষেত্রেও পোড়া কপাল এশিয়া আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকার। কাস্ত্রো বলেছেন, “স্বাভাবিক অবস্থায় পুষ্টি ও প্রজননের সহজাত প্রবৃত্তি দুটি পরস্পরের প্রতিযোগিতা করে চলে। একটি পিছিয়ে পড়লে আরেকটি চলে এগিয়ে এগিয়ে। দীর্ঘস্থায়ী বুভুক্ষা—বিশেষ করে প্রোটিন ও কিছু কিছু ভিটামিনের ক্ষুধা খাদ্যের প্রতি আকর্ষণ কমিয়ে দেয়, যৌন-ক্ষুধাকে তীক্ষ্ণ করে তোলে।” বিতর্কটি নিছক মনস্তাত্ত্বিক নয়; বিজ্ঞানী কাস্ত্রো তাঁর যুক্তির স্বপক্ষে শারীরবৃত্তিক ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি স্বীকার করেও একথা বলা যায় যে খাদ্যে প্রোটিনের অভাব উচ্চ জন্মহারের একমাত্র কারণ নাও হতে পারে। ১৯৬০ সালের F. A. O. Production Year Book-এ দেখা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনপ্রতি মোট প্রোটিন ও আমিষ জাতীয় প্রোটিন গ্রহণের পরিমাণ ছিল যখন ৯২ ও ৬৬ গ্রাম, একই সময়ে ভারতবাসী খেয়েছে ৫২ গ্রাম ও ৬ গ্রাম। অথচ ১৯৬০ সালের U. N. O. Statistical Year Book-এ প্রকাশ, ১৯৫৩-৫৯ সালের মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির বাৎসরিক হার ছিল শতকরা ১'৭ এবং ভারতে ছিল ১'৩। অর্থাৎ ১১ গুণ বেশি আমিষ প্রোটিন খেয়েও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হয়েছে ভারতের থেকে শতকরা ০'৪ ভাগ বেশি। মনে হয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদপদতা এবং খাদ্যে প্রোটিনের অভাব—মূলত এই তিনটি কারণ মিলিতভাবেই জন্মহার বৃদ্ধির [illegible] প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

তা সত্ত্বেও কাস্ত্রোর এই যুক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এই কারণে যে বিজ্ঞানের বিচারে পরাভূত ম্যালথাসবাদ আজ আবার নবরূপে প্রেতলীলার

নতুন ক্ষেত্র খুঁজে ফিরছে এশিয়া ও আফ্রিকার কোনো কোনো নব্য স্বাধীন দেশে। "কোটি কোটি মানুষের ব্যাধি বুভুক্ষা"—"ক্ষুধা থেকে মুক্তি চাই"—জাতিসংঘের এই স্বীকৃতি ও আহ্বান দেশে দেশে শোষক গোষ্ঠীকে আতঙ্কিত করে তুলেছে। চলেছে আদর্শক্ষেত্রে সূক্ষ্ম এবং সুকৌশলী পাল্টা আক্রমণ। বুভুক্ষার প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি—জনসংখ্যা যদি বেড়েই চলে, তাহলে খাদ্যাভাবও চলবে, এবং তা মেনে নিতেই হবে—এই হল নয়া-ম্যালথাসবাদীদের যত কিছু তত্ত্বকথার নিগূঢ়ার্থ। অথচ, বুভুক্ষা একটা সামাজিক প্রক্রিয়া। শ্রেণী বৈষম্য ও শোষণ, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার চরম অসঙ্গতিই যে বুভুক্ষার মূল কারণ, এই রূঢ় সত্যটিকে জনমানস থেকে লুকিয়ে রাখার জন্যই দেখানো হয় জনসংখ্যা বৃদ্ধির জুজু। কাস্ত্রো বলেছেন, "জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায় জ্যামিতিক সূত্রানুসারে, আর খাদ্যোৎপাদনের বৃদ্ধি হয় গাণিতিক নিয়মে…সুতরাং জনসংখ্যা বৃদ্ধি খাদ্যোৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে—ম্যালথাসের এই ভবিষ্যদ্বাণীকে ইতিহাস ইওরোপের পটভূমিকায় প্রত্যাখ্যান করেছে। বিগত শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই বহু দেশেই জন্মহার স্তিমিত হয়ে গিয়েছে।" অর্থাৎ কাস্ত্রোর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত—এশিয়া, আফ্রিকা এবং লাতিন আমেরিকাতেও সেই প্রক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটা অসম্ভব নয়—যদি বুভুক্ষাকে পরাস্ত করা যায়। এবং তা সম্ভব কারণ, "যুদ্ধ ও বুভুক্ষা মানুষেরই সৃষ্টি।"

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়—যে সব প্রশ্ন অহরহ সুপরিকল্পিতভাবে নিক্ষিপ্ত হচ্ছে ক্ষুধিত হওয়ার অপরাধ স্বীকার করানোর জন্য। জনসংখ্যা যে ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে, তার ফলে একদিন না একদিন বসুধা কি খাদ্য সরবরাহের শেষ সীমায় পৌছবে না? সে দিন কি আসন্ন নয়? একটানা দীর্ঘ ব্যবহারে ভূমির উর্বরতা ক্ষয় এবং উৎপাদন হ্রাস নিয়তির মতো অবশ্যম্ভাবী নয়? বুভুক্ষু এলাকাগুলির ক্ষুধামুক্তি কি কোনোদিনও সম্ভব? ক্ষুধার ভৌগলিক বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে এমনি ধারা আরো অনেক বাস্তব প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন কাস্ত্রো ভূরি ভূরি অবিসংবাদী তথ্য ও যুক্তি দিয়ে।

"ভূমণ্ডলের চাষ-যোগ্য জমি হল ১৬ বিলিয়ন একর, অর্থাৎ পৃথিবীর বর্তমান জনসংখ্যার প্রতিটি লোক পিছু ৮ একর হিসাবে।…বিশেষজ্ঞদের মতে জনপিছু ২ একর জমি থেকেই সুষম খাদ্য ও পুষ্টি পাওয়া সম্ভব।…অথচ এখনো ২ বিলিয়ন একরও চাষ করা হয় নি।…১৬ বিলিয়ন একর চাষ করতে পারলে বর্তমান জনসংখ্যার চতুর্গুণকে খাওয়ানো যাবে।…"

"বুভুক্ষার বিরুদ্ধে প্রথম বিজয় হবে সারা পৃথিবীতে খাদ্যের উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণ বাড়িয়ে। প্রকৃতি এবং বিজ্ঞান এই ব্যাপারে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। বিশাল বিশাল অব্যবহৃত ভূমিখণ্ড পড়ে আছে কর্ষণের অপেক্ষায়; কৃষির প্রযুক্তি-বিদ্যা দেখাতে পারে কিভাবে তার সদ্ব্যবহার করা যায়, কেমন করে বর্তমানের আবাদী জমিতে আরো বেশি ফসল ফলানো যায়, কিভাবে খাদ্য পাওয়া যায় সমুদ্র থেকে, এমন কি অজৈব পদার্থ থেকে।"

"জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার বিশেষজ্ঞ কমিটি সমীক্ষা করে বলেছেন, ভারতবর্ষে গমের ফলন দশ বছরে শতকরা ৩০ ভাগ বাড়ানো যায়। ২০ ভাগ বাড়ান যায় সার দিয়ে, ৫ ভাগ নতুন ধরনের বীজ ব্যবহার করে এবং ৫ ভাগ পোকা-মাকড় ও ব্যাধির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এরপর অন্যান্য ব্যবস্থা মারফৎ এই বৃদ্ধির হার তোলা যায় শতকরা ৫০ ভাগ পর্যন্ত।…এযাবৎ ভারতে চাষ করা হয়েছে শুধু অপেক্ষাকৃত উর্বর এবং সহজে সেচযোগ্য জমিটুকু। অকর্ষিত প্রায় ১৫০ মিলিয়ন একর আবাদী জমি আজো চাষ করার অপেক্ষায় পড়ে আছে।…সমগ্র চাষযোগ্য জমির প্রায় একতৃতীয়াংশ সেটা।"

সুতরাং "ক্ষুধামুক্তি কোনো স্বপ্নাশ্রয়ী প্রকল্প নয়, সম্পূর্ণ সাধনযোগ্য লক্ষ্য। প্রয়োজন যা; তা হল জমিতে যারা আছে, তাদেরকে আরো ভালোভাবে পুনর্বাসন করা, এবং জমির দানকে আরো সুষ্ঠুভাবে বণ্টন করা।"

সমর রায়চৌধুরী

মাতৃমন্ত্র। শ্রীকালীচরণ ঘোষ। প্রইস্টার্ন পাবলিশার্স, কলিকাতা। একটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'মাতৃমন্ত্র' দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা সংগ্রহ। এই সংগ্রহে লেখক 'অতি উচ্চস্তরের সাহিত্যে'র সঙ্গে নিতান্ত সাময়িক অনুভবের প্রয়োজনে লিখিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতাকে একযোগে স্থান দিয়েছেন। গ্রন্থটি মূলত "বঙ্গভঙ্গ এবং তাহার পূর্ব হইতে দেশপ্রেম" কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল তার একটা অন্তরঙ্গ পরিচয় দেবার আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বাংলা কবিতার দেশাত্মবোধক বৈশিষ্ট্য প্রথম উদঘাটিত রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' কাব্যে। অবশ্য এর আগেই, সংকীর্ণ হলেও, ঈশ্বর গুপ্তই প্রথম স্বদেশপ্রেমের কথা উচ্চারণ করেছিলেন—

স্বদেশের প্রেম যত সেই মাত্র অবগত
বিদেশেতে অধিবাস যার
ভাবতুলি ধ্যান করে চিত্রপটে চিত্র করে
স্বদেশের সকল ব্যাপার।

কবিতায় দেশপ্রেমের এই ধারা রঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্য দিয়ে সার্থকভাবে প্রবাহিত হয়ে এসে ব্যাপ্তির সার্থকতায় পরিণতি লাভ করেছে হিন্দুমেলার যুগে (১৮৬৭)। তারপর ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠার পর স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্র সূচনার সঙ্গে সঙ্গেই দেশপ্রেমের গান ও কবিতা হৃদয়ের উন্মাদনাময় আন্তরিক আবেগে স্বতন্ত্র মর্যাদায় স্বতোচ্ছ্বাসিত হয়ে ওঠে। এই দেশপ্রেমের কবিতা ও গানের মধ্যেই তাই জাতীয় আবেগের পরিচয় আত্মগোপন করে রয়েছে।

সংকলনের দিক দিয়ে বহু অপূর্ণতা রয়ে গেছে। বহু বিখ্যাত কবিতা বা গান, যেগুলো সাহিত্য হিসাবেই শুধু বিখ্যাত নয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের সঙ্গেও যেগুলো ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এই সংগ্রহে স্থান পায় নি। হিন্দুমেলার (১৮৬৮) দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্‌বোধিনী সঙ্গীত হিসাবে গাওয়া সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গাও ভারতের জয়' শীর্ষক গানটি (মিলে সব ভারত সন্তান একতান মনপ্রাণ—গাও ভারতের যশোগান ইত্যাদি) এবং কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে (২৮শে ডিসেম্বর, ১৯১১) গাওয়া সরলা দেবীর—'অতীত গৌরব বাহিনী মম বাণী—গাও আজি হিন্দুস্থান'—শীর্ষক গানটি সংকলনে স্থান না দেওয়া আমার কাছে গুরুতর ত্রুটি বলে মনে হয়েছে। (প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—ভারতের জাতীয় সঙ্গীত 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটিও সংকলনে স্থান পায়নি)

তবু এই সব অপূর্ণতা সত্ত্বেও গ্রন্থ-সংকলকের উদ্দেশ্য অভিনন্দনযোগ্য। এবং তাঁর উদ্দেশ্য অংশত হলেও সফল হয়েছে।

দেবব্রত বিশ্বাস

পাঠকগোষ্ঠী

"পরিচয়"-প্রসঙ্গে

'পরিচয়' আমার সবচেয়ে প্রিয় পত্রিকা। আজ থেকে নয় অনেকদিন থেকেই। তবুও বলতে দ্বিধা নেই মাঝে-মধ্যে কখনো-সখনো 'পরিচয়' আমাকে নিরাশ করেছে। তবু ধীরে ধীরে আবার সেই অতীতের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হচ্ছে দেখে আরো ভালো লাগছে। পরিচয় মূলত সাহিত্য পত্রিকা হলেও একটা সুস্থ জীবনবোধ-এর সঙ্গে জড়িত। আমার অনুরোধ, সে বোধকে রাজনৈতিক সংস্কারের গোঁড়ামির পর্দা দিয়ে যেন ঢেকে রাখা না হয়। আর সবচেয়ে বড় দাবি, যাই করুন সাহিত্যের জন্য করুন। সাহিত্যের জন্য রাজনীতিতে আপত্তি নেই, কিন্তু রাজনীতির জন্য সাহিত্য আপত্তির বৈকি। আমার মনে হয় অন্যান্য পত্রিকার মত পরিচয় শুধু পাঠকের সময় কাটানোর জন্য ব্যবহৃত হয় না। বরং যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেন তাঁদের 'গাইড' করতে সাহায্য করে। সম্প্রতি বাঙলা সাহিত্যে একটা দুর্লক্ষণ দেখছি যে, ভাষা এবং আঙ্গিক নিয়ে—অত্যন্ত বাড়াবাড়ি আরম্ভ হয়েছে। বিষয়বস্তু দুর্বল বলেই কি বহিরঙ্গের চটক বেশি? আর ভাষা নিয়ে যা আরম্ভ হয়েছে মনে হয় যেন, যে কবি কবিতা কিংবা গল্পকার ছোট গল্প লেখেন, সে-ই ভাষা নিয়ে শব্দ নিয়ে যেন গবেষণা করছেন। নতুন শব্দ, নতুন ভাষা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করে সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে প্রচলিত ভাষা কিংবা শব্দ কিছুতেই ব্যবহার "করব না" এমন পণ করে যত পার বিদেশী এবং মৌলিক (লেখকের নিজস্ব এবং লেখক নিজেই শুধু তার অর্থ বোঝেন) শব্দ প্রয়োগ করে পাঠকের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা আরম্ভ করলে কিছুদিনের মধ্যেই লেখকদেরই পাঠকের ভূমিকা নিতে হবে। পাঠক বলে আলাদা জাত আর থাকবে না। আমার মনে হয় লেখকদের বক্তব্য কিছু থাকলে সহজ ভাবে তার প্রকাশ করা উচিত। বক্তব্য অস্পষ্ট বলেই কি ভাষার হেঁয়ালী এবং আঁধার সৃষ্টি করবেন? তার ফলে নানান পাঠক তার নানান অর্থ ধরে নেবেন এবং লেখক নিজেই অবাক হবেন, "আশ্চর্য তো, এত অর্থ লুকিয়ে ছিল!" "পরিচয়ের" লেখকদের এ বিষয়ে ভেবে দেখতে সবিনয়ে অনুরোধ

করছি। জানি যে রবীন্দ্র যুগ এটা নয় বরং এটাকে "রকেট যুগ" অথবা "আণবিক যুগ" বলাই সঙ্গত তবুও না বলে পারছি না যে, সেই রবীন্দ্রনাথও তো গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ কম লেখেন নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথে ভাষাটা এই স্বচ্ছন্দচারী যে আধুনিক লেখক বুঝি ওই ভাষায় লিখতে লজ্জা পাবেন। আধুনিক পাঠক কিন্তু এখনো ওই "পুরোনো" স্টাইলেই বুঝি বেশি রস আহরণ করেন। এখনো কিছু শ্রদ্ধেয় লেখক সহজ ভাবে স্পষ্ট কথা লিখতে পারেনী হন। যেমন, শ্রীঅন্নদাশংকর রায় এবং আরও কেউ কেউ। তারা কেউ অশিক্ষিত নন। এককালে ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে পরিচয়ের মাধ্যমে যে তর্ক-বিতর্ক চলতো, তাতে অংশ গ্রহণ করতেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র সেন, হিরণকুমার সান্যাল, বিষ্ণু দে প্রমুখ দিকপাল কবি-সাহিত্যিকরা। আবার তেমনি সাহিত্যিক বিতর্কের সূত্রপাত করা কি সত্যিই অসম্ভব ?

মিহির রাহা

নব কলেবর 'পরিচয়' সম্পর্কে আপনারা পাঠকের স্বাধীন মতামত আহ্বান করেছেন। প্রচুর ভরসা পেলাম।

প্রধানত দুটো কারণে পরিচয়কে ভালবাসি এবং পরিচয়ের নিয়মিত পাঠক। (১) এটি একটি প্রগতিবাদী (মার্কসীয়) দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী (২) পরিচয়ে dogma অপেক্ষা যা পেয়েছি তা হচ্ছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার একটি বলিষ্ঠ মনোভাব। নিঃসংশয়ে তাই পরিচয়ের কাছে প্রত্যাশা আমার এবং আমার মতই অনেকের, অনেক।

অধিক বাক্‌বিস্তারে না গিয়ে সংক্ষেপে আমার কয়েকটি প্রস্তাব নিবেদন করি। আশা করা যায় তার মধ্যেই পরিচয়ের কিছু অভাব এবং সেই সম্পর্কে একজন পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির কিছুটা প্রতিফলন থাকবে।

(১) বাঙলার অনুবাদ সাহিত্য লজ্জাজনক রকমের দরিদ্র। পরিচয়ের পাতায় নিয়মিত গুরুত্বের সঙ্গে সুন্দর ও সার্থক না হোক অন্তত অনুগত (faithful) অনুবাদের প্রকাশ হোক। কোন সারানুবাদ নয়। (তার কারণ—এগুলি অসমর্থনীয়। তথাকথিত সারানুবাদগুলিতে যে ধরনের স্বৈরাচার প্রকাশ পায়, কোন যুক্তিতেই তাকে সমর্থন করা চলে না।) অনুবাদগুলি পরিকল্পিত ভাবে প্রকাশিত হোক। সম্ভবত এর প্রয়োজন ও গুরুত্ব সম্পর্কে

বলাই বাহুল্য হবে। বাঙলা ভাষাতেই আমরা রঁলা, তলস্তয়, দস্তয়েভস্কি, টমাস মান, জয়েস, প্রুস্ত, আনাতোল ফ্রাঁস, কাফ্‌কা, মলিয়ের, ইবসেন, চেকভ, পড়তে চাই! বাঙালী বলেই অর্থাৎ ইংরেজী জানি না এই অপরাধেই কি বিশ্বসাহিত্যের শিল্পকীর্তিগুলির সম্ভোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত থাকতে হবে? যথারীতি একটি "মধ্যবিত্ত" সাহিত্যরুচি নিয়েই আমায় সন্তুষ্ট থাকতে হবে? এসম্পর্কে "পরিচয়ের" কি কোন দায়িত্ব নেই? ইতিহাস বিচারে না, শুধু মধুসূদন থেকে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের বয়স যদি এক শ বছর ধরে নিই তবে এই সময়ে মৌলিক সৃষ্টি প্রয়াসের তুলনায় সদ্ অনুবাদ সাহিত্যের লজ্জাজনক অপ্রতুলতা আমাদের সামগ্রিক দায়িত্ববোধের অভাব-ই কী সূচিত করে না? অথচ অনুবাদ ছাড়া পাঠক সমাজের সামগ্রিক বুদ্ধিবৃত্তি ও সাহিত্যরুচির মানোন্নয়ন ঘটে না একথা কম বেশি আমরা তো সকলেই বুঝি।

(২) পরিচয়ে নিয়মিতভাবে (ন-মাসে ছ-মাসে একবার নয়) নাটক প্রকাশিত হওয়াও একান্ত বাঞ্ছনীয়। কেন?—বলাই বাহুল্য মনে করি।

(৩) 'সমাজতন্ত্রে শিল্পচর্চা' জাতীয় বিতর্কের যখন সূত্রপাত হয় তখন বিশেষ বিভাগের প্রতিনিধিস্থানীয় শিল্পী কর্মীদের আলোচনায় আমন্ত্রণ করাই যুক্তিসঙ্গত। নির্দ্বিধায় বলছি শঙ্কর আচার্য বা সতীন্দ্র চক্রবর্তীতে আমার আপত্তি নেই; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যিই সৃষ্টিশীল লেখক-শিল্পীদের মতামতও জানার ব্যবস্থা ছিল একান্তই বাঞ্ছনীয়। তাতে নিঃসন্দেহে আমাদের উপকারও অনেক বেশি।

(৪) "পরিচয়"-এর ঐতিহ্যময় পুস্তক-পরিচয় বিভাগটি অধিকতর পরিকল্পনা, সতর্কতা ও গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হোক। এ কথা আমাদের সকলেরই মনে না থেকে পারে না যে "দেশ" ও "পরিচয়" একজাতীয় পত্রিকা না।

অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়

পরিচয়-এর পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের বিজয়ার প্রীতিসম্ভাষণ জানাই।

এত একমাসে সংস্কৃতি-জগতে অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে—তা সবগুলির সম্যক আলোচনা এবারের জন্য মুলতবী রাখতে হল। প্রকাশনা দ্রুত করার জন্যই এ-সিদ্ধান্ত। শারদ-উৎসব উপলক্ষে ছাপাখানা বন্ধ ছিল, খোলবার পর থেকে উর্ধ্বশ্বাসে কাজ করেও সময়মত কাগজ বের করা সম্ভব হল না, অনেক বিভাগই নমঃ নমঃ করে সারতে হল।

তবু দু-একটি ঘটনার অন্তত উল্লেখ না করলে নিজেদের কাছেই আমরা অপরাধী হব। এই রকম উল্লেখযোগ্য ঘটনার একটি হল সাহিত্য ও বিজ্ঞানের নানা শাখায় নোবেল পুরস্কার ঘোষণা। বিজ্ঞান বিষয়ক নোবেল পুরস্কার সম্পর্কে আগামী বারে বিস্তারিত আলোচনা পত্রস্থ করা যাবে, আশা করি। সাহিত্য বিষয়ে সে প্রতিশ্রুতি দেওয়া অবশ্য কঠিন। কেননা সাহিত্যের নোবেল পুরস্কার যিনি পেয়েছেন সেই কবি জর্জ সেফেরিস্ একাধিক অর্থে গ্রীক, আমাদের কাছে। নোবেল কমিটি এদিক থেকে তাঁদের পুরনো ইতিহাসেরই পুনরাবৃত্তি করলেন—ঝোলা থেকে বৎসরান্তিক বিস্ময় বের করে। বিস্ময় বলব, কেননা বাজারে গুজব ছিল জঁা-পল সার্ত্রে পাবলো নেরুদা এবারে নোবেল পুরস্কার পাবেন। নেরুদা লাল এবং সার্ত্রে ফিঁকে লাল বলে বিদিত। তবু মানুষ গুজবে কান দিয়েছিল এই কারণে যে তারা ভেবেছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বরফ-গলা শুরু হয়েছে সুইডিশ আকাদেমির টিনের দেবতাদের তা স্পর্শ করবে। ধন্য আশা কুহকিনী!

পুরস্কার প্রসঙ্গে মনে পড়ল, 'ফেরারী ফৌজ' নাটকের জন্য এবারে আকাদামি পুরস্কার পেয়েছেন নট ও নাট্যকার শ্রীউৎপল দত্ত, আর নাট্যপ্রযোজনার পুরস্কার পেয়েছেন নট শ্রীসবিতাব্রত দত্ত। সাহিত্য আকাদামির এই সিদ্ধান্তে বাংলার নাট্যামোদী সমাজ খুশি হবেন, পরিচয়-এর আমরা তো বটেই। দুই দত্ত—উৎপল এবং সবিতাব্রত—পরিচয়-এর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁদের সম্মানে আমরা নিজেদের সম্মানিত মনে করছি।

এই ক-মাসের একটি দুঃখজনক ঘটনা শ্রীশুভময় ঘোষের অকালমৃত্যু। মাত্র কিছুদিন আগে তিনি মস্কো থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। পরিচয়-এ

আমরা তাঁর দুটি লেখা—একটি রুশ কবিতা এবং একটি প্রবন্ধের (উলানোভার) তরজমা প্রকাশ করেছিলাম। ভবিষ্যতে তাঁর কাছ থেকে আরও লেখা পাব আশা ছিল। কিন্তু মৃত্যুর শীতল হাত তাঁকে আমাদের মধ্য থেকে ছিনিয়ে নিল। শুভময় পরিচয়-এর শুধু লেখক ছিলেন না, অনেকের তিনি ছিলেন অন্তরঙ্গ সুহৃদ। তাঁর অকালপ্রয়াণে আমরা আত্মীয়বিয়োগ ব্যথা অনুভব করছি।

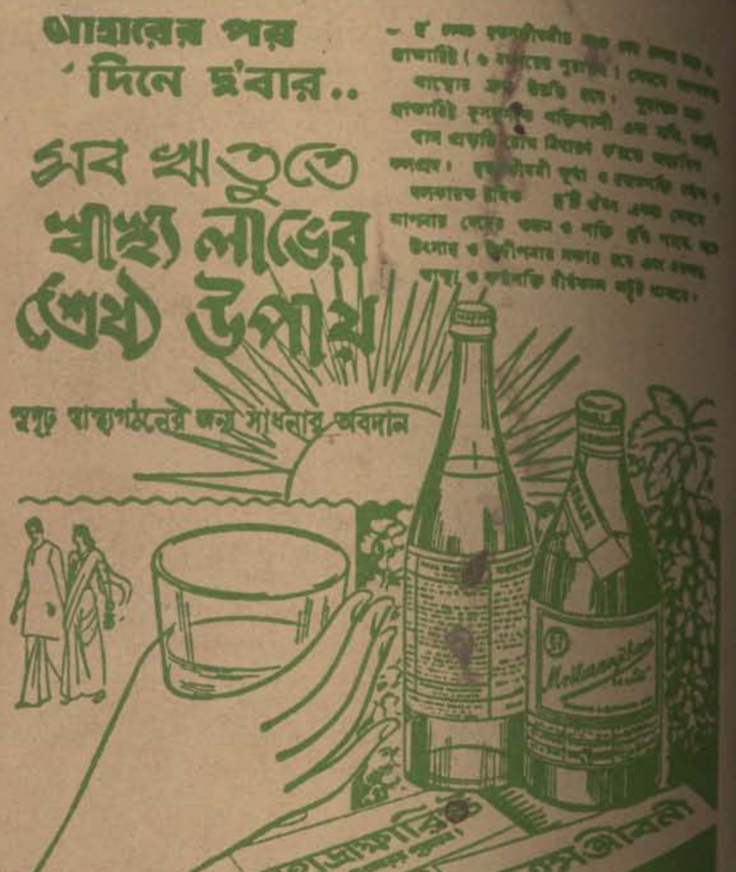
আজ থেকে অর্ধশতক আগে ১৯১৩-এর ১৩ই নভেম্বরের অবিস্মরণীয় সেই দিনটি। আমাদের রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীর কবির আসনটিতে অভিষিক্ত হলেন। কবির ইংরাজীতে অনুদিত "গীতাঞ্জলি" সে বৎসর সুইডিশ একাডেমির নোবেল পুরস্কার লাভ করল। সমগ্র প্রাচ্যখণ্ডের মধ্যে সেই সর্বপ্রথম কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবিরূপে জগৎজোড়া হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হলেন। রবীন্দ্রনাথের বৈজয়ন্তী এইখানেই—ইউরোপের চোখ ঝলসাবার জন্য নয়, উদ্বেগ, সংশয় ও দ্বিধাদীর্ণ পৃথিবীতে শান্তির ও মৈত্রীর সঞ্জীবনীর অমৃত এই ভারতীয় মহাকবির হাত থেকে বিশ্ব উপহার লাভে ধন্য হল। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির সেই পঞ্চাশত্তম বার্ষিকীর দিনটিকে আমরা তাই স্মরণ করি। এ আমাদের গর্ব ও আত্মোপলব্ধির দিন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উত্তর সাধনা কি আমরা বহন করে চলতে পেরেছি?

সম্প্রতি মস্কোয় যে আংশিক পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা বন্ধের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে আমরা তাকে স্বাগত করি। আমরা মনে করি পৃথিবীতে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার পক্ষে এই চুক্তি একটি সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ। আমরা আশা করি এই শুভ উদ্যোগের বিকাশ হবে, পারমাণবিক অস্ত্র-পরীক্ষা পুরোপুরি নিষিদ্ধ হবে, পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করা হবে, অস্ত্র-প্রতিযোগিতা বন্ধ হবে এবং আমাদের জীবদ্দশাতেই অস্ত্রবর্জিত পৃথিবীর স্বপ্ন সফল হবে। আমরা আমাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে যেতে পারব—পারমাণবিক ধুমে বিষাক্ত পৃথিবী নয়, সুখ-শান্তির এক ঝলমলে পৃথিবী।

এই সংখ্যার ছাপার কাজ যখন সমাপ্তির মুখে তখন কলকাতা সফরে এসেছিলেন সোভিয়েত মহাকাশচারী ত্রয়ী—ভালেন্তিনা তেরেশকোভা, আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ ও ভালেরি বিকোভস্কি। মহানগরে পা দিয়েই কলকাতাবাসীর চিত্ত জয় করে নিয়েছিলেন এই মহাকাশ-বিজয়ী বীরেরা। বিশেষ করে কলকাতাবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করেছেন বিশ্বের প্রথম মহাকাশচারিণী তেরেশকোভা। এ-কাহিনীও আগামী সংখ্যা পর্যন্ত মুলতবী রাখতে হল। তাঁদের প্রতি অভিনন্দন জানিয়ে পত্রান্তরে প্রকাশিত শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ের ছোট কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিচ্ছি :

মহাশূন্য মনোলোভা
ভালেন্তিনা তেরেস্‌কোভা।
তোমার তরে, ভালিয়া,
পাঠাই আমার ডালিয়া।
সামান্য এই ক'টি লাইন
আমার প্রীতির ভ্যালেন্টাইন।

শচীন বস্থ


আহারের পর
'দিনে দু'বার..
সব ঋতুতে
স্বাস্থ্য লাভের
শ্রেষ্ঠ উপায়
সুস্থ স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
মৃতসঞ্জীবনী
সাধনা ঔষধালয় • ঢাকা


পরিচয়